ধর্ম্মপ্রচার-গ্রন্থাবলীর ৩-৪র্থ সংখ্যা

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব

——:•:——

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল-

প্রণীত

প্রকাশক —

ডাক্তার শ্রীকানাইলাল গুপ্ত, বি, এ,

১২১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

——

১৩২২

মূল্য ৷৵০ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।

মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌।

৩৪ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী

মহাশয়ের করকমলে

এই গ্রন্থখানি

সাদরে অর্পিত

হইল।

দাদা! গুরুর প্রতি আপনার একান্ত অনুরাগ। আপনি গুরুকে সাক্ষাৎ করুণাবতার দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। আপনার এই ভাবটি আমার বড় ভাল লাগে; তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। আশা করি, আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন এই দীন উপহার খানিও আপনার সেই স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবে না। ইতি

আপনার স্নেহের

ভূপেন।

ভূমিকা

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-পদ্ম ভক্তিপূর্ব্বক বন্দনা করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। শ্রীগুরু প্রসন্ন না হইলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সমিৎপাণি হইয়া গুরুসকাশে উপনীত হইবার প্রথা এদেশে বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই গুরুবাদ আর্য্যঋষিদিগের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ মত। তাঁহারা জানিতেন গুরুকৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার নহে। তাই আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ইহার প্রশংসা দৃষ্ট হয়। সামান্য বিদ্যাশিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইলেও যখন গুরুসাহায্য ব্যতীত হয় না, তখন সকল বিদ্যা অপেক্ষা কঠিন এই যে ব্রহ্মবিদ্যা ইহার আয়ত্তের জন্য গুরুকরণ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ইহাতে আর্য্যঋষিদিগের অনভিজ্ঞতা

বা কুসংস্কার প্রকাশিত হয় না, প্রকৃত সাধক মাত্রেই ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। নিতান্ত অহঙ্কারাচ্ছন্ন না হইলে এই গুরুবাদের প্রতি কেহ অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না। গুরুই ভবাব্ধি জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহারই প্রসাদে ভক্তিমান্ শিষ্য এই দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। আর্য্যঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকাতে এ তত্ত্বটি যথাজ্ঞান প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সফল হইয়াছি কি না জানি না। বর্ত্তমান যুগে "গুরুবাদ" শিক্ষিত লোকদিগের নিকটও শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু অযোগ্যহস্তে এই গুরুভার ন্যস্ত হওয়ায় কিছু আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। মিথ্যা কখন সত্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না, অসত্যবাদীদের মিথ্যা রটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ভক্তিমানের চিত্তেও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্য ভীত হইয়াছি। শাস্ত্রানুশাসন অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করাতেই এই অনর্থ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। তাই যথার্থ গুরুবাদ ও দীক্ষাতত্ত্বটিকে পূর্ব্বাচার্য্য-

প্রদর্শিত প্রণালীমত যথাসাধ্য আমি আমার দেশবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কথোপকথনচ্ছলে বুঝাইলেই তত্ত্বটি বুঝিবার সুবিধা হয়, তাই আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছি। সত্যের অনুরোধে স্থলবিশেষে কিছু কিছু অপ্রিয়ভাষণ করিতেও হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহাতে আমার অপরাধ না লইয়া ক্ষমা করিবেন। কারণ আমি কাহারও প্রতি আক্রোশবশতঃ বা দ্বেষবুদ্ধিতে এ গ্রন্থ লিখি নাই। যাহাতে সত্য প্রচার হয় এবং আমার দেশবাসী ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ সত্যের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হন, এবং যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী—তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে কিছু সাহায্য পাইলেও পাইতে পারেন, এই আশায় এই পুস্তক প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর ও দুরূহ এবং হিন্দুধর্ম্মের ইহা একটি মর্ম্মস্থান, সুতরাং আমি যে উদ্দেশ্যানুরূপ লিখিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আমার মনে হয় না। তবে এই গ্রন্থ পড়িয়া এক জনের মনেও যদি এই তত্ত্বটি আলোচনা করিবার উৎসাহ জন্মে, তবে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে না।

পরিশেষে বক্তব্য সোদরকল্প অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর শ্রীমান্ বিধুশেখর শাস্ত্রী ইহার "প্রুফ" গুলি দেখিয়া দিয়াছেন এবং যথাস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের বহু চেষ্টাতেও যে গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

১৩১৬ চৈত্র পুরীধাম— শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল
চটক পাহাড়।

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব।

মধু পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপ

মধু পণ্ডিত ও দীননাথ চট্টরাজ আসীন,

শ্যামাকান্ত, রামব্রহ্ম চট্ট ও অখিলবন্ধুর প্রবেশ।

মধু পণ্ডিত। কি হে ভায়া, কোথায় গিয়েছিলে? এস, ব'স।

রামব্রহ্ম। আরে ভাই আমার আর কর্ম্মভোগের কথা বল কেন? সন্ধ্যা হলো প্রায়, আজ তবে আসি।

মধু। আরে এস, ব'স। কোথায় সন্ধ্যা, এখনও ঢের দেরী। এস একটু তামাক ইচ্ছে কর। বলি, রোদ চম্ চম্ করছে, এহেন সময়ে কোথায় গিয়েছিলে

বল দেখি? মনটা যে তোমার কেমন ভার-ভার ঠেক্‌চে? কি হলো আবার?

রামব্রহ্ম। না, না, তেমন কিছু নয়। মন ভালই আছে।

মধু। এইত দাদা, নিজেই ধরা দিচ্চ। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। অন্য কিছু না হলেও বউঠাকুরুণের কাছে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ হয়ে থাকবে, তা তোমার চেহারা দেখলেই অনুমান করা যায়। বল দেখি ব্যাপারটা কি? আর ত এদিকে আসই না!

দীনচট্ট। উনি এখন ডুমুরের ফুল হয়েছেন। লোকে আর এখন ওঁর টিকি দেখতেই পায় না। এত রোদ থাকতে যে উনি বেরিয়েচেন, এর মধ্যে একটা বিশেষ কারণ আছেই আছে, নচেৎ স্বর্গ্যি দেবের এমন কি ভাগ্যি যে, তিনি তাঁকে দেখতে পান!

রামব্রহ্ম। বলে নাও ভাই—যা তোমাদের প্রাণে আছে; মুখ তো আর বন্ধ করবার আইন নেই!

দীন চট্ট। বলই না তবু এমন সময় কোথায় পদার্পণ করেছিলে? লোকে রাজারই দর্শন পায় না। তোমরা হলে রাজগুরু—তোমাদের দর্শন লাভ অত্যধিক দুর্লভ!

রামব্রহ্ম। আরে ভাই, আমার আর কর্ম্মভোগের কথা বল কেন, ও পাড়ার গাঙ্গুলীদের গুরুঠাকুর এসেছেন, তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম।

মধু। হাঁ, হাঁ, তাঁর নাম শুনেছি বটে, তিনি বেশ লেখা পড়া জানেন, পণ্ডিত লোক শুনেছি।

দীন চট্ট। লোকটাকে কি রকম দেখে এলে বল দেখি? আমিও একবার যাব-যাব ভাবছিলাম। তাঁর তো এ গ্রামে খুব পশার প্রতিপত্তি হয়েছে।

রামব্রহ্ম। পশার হবে না কেন? চেষ্টা করলে মধু পণ্ডিতেরই কি পশার হয় না?

দীন চট্ট। যাই বল ভাই, এইবার তোমাদের অন্ন উঠলো।

রামব্রহ্ম। আমার তাতে কি হবে?

দীন চট্ট। তোমার একটু বেহ্ম-বেহ্ম ভাব আছে তা জানি, তুমি মন্ত্র-টন্ত্র দেওয়া-নেওয়ার ধার ধার না বটে; কিন্তু তোমার দাদা, কাকা, এঁদের তো প্রধানতঃ এই উপজীবিকা। এখন যদি সব লোকেই রাস্তার সন্ন্যাসী ধরে গুরু করতে লাগলো, তবে পুরাতন গুরুঠাকুরদের তো ব্যবসার দফা রফা হয়ে যায়!

রামব্রহ্ম। ও আপদ গেলেই ভাল! মিথ্যামিথ্যি কেবল লোকগুলোকে ঠকানো!

মধু। যা'ক, কেমন সাধু দেখে এলে বল দেখি। ভাল লোক বলে তাঁর প্রশংসা আছে।

রামব্রহ্ম! ভাল লোক আর আমার মাথা! কেবল ঘাড় ভাঙ্গবার যম! কয়েকজন ভণ্ড মিলে তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলে খাড়া করে তুলেচে, আর যত মূর্খ এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়চে। এই যে অখিলকে দেখচেন, ইনি সেই দলের একজন। এঁরা সব জাহির করে বেড়াচ্চেন যে, সাধু গায়ে হাত বুলাইয়া দিবামাত্রই নাকি রোগীর রোগ নষ্ট হয়ে যায়, দরিদ্র ধনী হয়ে যায়, মূর্খ পণ্ডিত হয়ে যায়, আর কাণা, কুঠে, নুলো, খোঁড়া সবই নাকি তাঁর কৃপা-দৃষ্টিতে আরাম হয়ে উঠে! বেশ পয়সা রোজগারের ফিকির করেছে! গোটে গোটে লোক এসে পয়সা ঢালছে! খুব আনন্দে দিন কেটে যাচ্চে! আমার স্ত্রীতো তাই শুনে তাঁর কাছে মন্ত্র নেবার জন্য পাগল! স্ত্রীলোকের বুদ্ধি তো, যা শুনে তাই বিশ্বাস করে, আর তাই পাবার জন্য নেচে উঠে!

মধু। তাই বুঝি স্ত্রীর অনুরোধে তাকে দেখতে গিয়েছিলে?

রামব্রহ্ম। শুধু স্ত্রীর অনুরোধেই বা কেন, নিজের গরজেও কতকটা। আমার স্ত্রী তো মন্ত্র নেবার জন্য ক্ষেপেচে, সে তার কাছে মন্ত্র নেবেই। আমার শ্যালকদের মধ্যেও অনেকেই তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েচে। তবুও, অজ্ঞাতকুলশীল লোকটাকে হঠাৎ গুরু করে পাছে বিপন্ন হতে হয়, তাই একবার তার ভাবগতিকখানা বুঝতে গিয়াছিলাম।

মধু। ভাবগতিক কি দেখলে বল দেখি? তুমিও তাঁর কাছে মন্ত্র নেবে নাকি?

রামব্রহ্ম। রামচন্দ্র বল! আমি আবার সে ব্যাটার কাছে মন্ত্র নিচ্চি! মন্তর-তন্তরের উপর তো বিশ্বাস নেই-ই, তার উপর ওই ভূঁইফোড় গুরুগুলির উপর আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু বলব কি মশাই, গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানায় লোক ধরে না। দিন নেই, রাত নেই, তার কাছে মন্ত্র নেবার জন্য দলে-দলে লোক আসচে। সে ভীড়ের মধ্যে থেকে গুরুঠাকুরকে বার করাই দায়। বালক বৃদ্ধ, মেয়ে-পুরুষ, যুবক-যুবতী, সবাই তার কাছে গিয়ে মন্তর

নিচ্চে। ব্যাটা কি ভেল্কি দেখাচ্চে, ভগবান্ জানেন!

মধু পণ্ডিত। বল কিহে, ব্যাপারখানা কি বল দেখি। মন্ত্র নেবার দিন কই? ছাই, এযে অকাল!

দীন চট্ট। বুঝচেন না মশায়; একি আর জ্ঞানী লোকে, পণ্ডিত লোকে মন্ত্র নিচ্চে? সব অকাল-কুষ্মাণ্ডগুলোই মন্ত্র নিচ্চে, তাদের আবার কালা-কাল!

মধু পণ্ডিত। বাঃ, কালাকাল মানতে হবে বৈ কি। দীক্ষাগ্রহণ, এ একটা সংস্কার, যেমন তেমন কথা নয়। এক দিনে অত লোকের মন্ত্রই বা হয় কি করে? হোম-টোম করতে হবে ত?

দীন চট্ট। ক্ষেপেচেন? হোম আবার কে করচে? সব ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

মধু পণ্ডিত। সকলেই বা তাঁর কাছে মন্ত্র নেবেন কি করে? যাদের গুরুবংশের ধারা লোপ পেয়ে গিয়েছে, তাঁরা নিলেও নিতে পারেন; কিন্তু কুলগুরু বর্ত্তমান থাকতে যার-তাঁর কাছে মন্ত্র নেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

দীন চট্ট। রেখে দাও তোমার শাস্ত্র। আর সে দিন কি আছে যে, তোমরা যা বলবে তাই হবে?

এখন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার লোক সব হয়েছে! তোমাদের বিধান-টিধান আর চলবে না বাপু!

মধু পণ্ডিত। তাইত। তাঁর কাছে মন্ত্র কি করে সকলেই নিতে পারে?

রামব্রহ্ম। আর মন্ত্র নিতে পারে? দেশ শুদ্ধ লোক নিচ্চে দেখে এলাম। স্ত্রী-পুরুষ সবাই তার শিষ্য হবার জন্য ব্যাকুল। কি জানি ব্যাটা কি যাদু জানে। আবার জ্যাঠা মহাশয়ের দুই ছেলে তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়ে এসেছে।

দীন চট্ট। বল কি হে? এঁ্যা, সার্ব্বভৌম মশায়ের ছেলে হয়ে কি না মেড়াপোড়ার কাছে মন্ত্র নিয়ে এল! হরেকৃষ্ণ বল! এসব হলো কি?

রামব্রহ্ম। জ্যাঠামশায় তো শুনে তাকে খড়ম-পেটা করবার জন্য তার পিছনে-পিছনে ধাওয়া করে-ছিলেন। সে তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে। বুঝেছ দীন দাদা, এই পরমহংসগুলির হংসত্ব এতটুকুও নেই। ব্যাটারা সবাই এক একটি পরম বক! ঠিকই বলেছ তুমি, আর আমাদের বংশে গুরুগিরির পাট উঠলো। ভালই হলো, ওসব ভণ্ডামীর চেয়ে ঢের ভাল। গুরু-কুরুতে কি হয়। সাধু-টাধু কিছুই

নয়। এক কড়ারও উপকার নেই, অথচ লোকের অর্থ নষ্ট, মনঃকষ্ট !

মধু পণ্ডিত। দেখ, এইগুলো তোমাদের ভয়ঙ্কর দোষ। ধান ভানতে শিবের গীত ! ও লোক-টাকে ভাল লাগল না ; আচ্ছা বেশ, ভাল লাগলো-নাতো লাগলো না। তাই বলে বিশ্বশুদ্ধ সাধু, ব্রাহ্মণ, গুরুর উপর ঝাল ঝাড় কেন ? আমিও তো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, গুরু পুরোহিতের ব্যবসা করে থাকি। সবাইকেই তুমি চোর বলতে চাও নাকি ? গুরু-টুরুর কোন প্রয়োজন নেই, এরই বা অর্থ কি ?

রামব্রহ্ম। হরেকৃষ্ণ ! তোমার মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে কি কিছু বলচি ? ওই ভণ্ডব্যাটারা তোমার কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য নয়, আর নকলের গুরু সেজে বসে আছে ; এই দেখলেই তো মনটা খারাপ হয়ে যায় কি না। আর তোমার কথা ছেড়েই দাও, তুমি গৃহী হও, আর যাই হও, অনেক নাম জাদা সন্ন্যাসীর চেয়ে তুমি ঢের ভাল। আমি ওই জোচ্চোর ব্যাটাদের চেয়ে ঢের উচ্চে তোমার স্থান মনে করে থাকি। তোমার মত গুরু পেলে তো লোকের ভাগ্য। তাদের

সেই ভাঁগা থাকলে তো তোমার কাছে শিক্ষা পাবে।

মধু পণ্ডিত। বেশ বাবা বেশ। একধার থেকে আমার প্রশংসাটা করে যাও, একবারে সপ্তম স্বর্গের চূড়ায় এনে তবে ক্ষান্ত হয়ো। পার যদি আবার এক ধাক্কা দিয়ে নরকে ফেলে দিও। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গুরু বা সাধুর দোষ নেই, তাঁরা একবারে নির্দোষ, তা বলচিনি; তবে তোমাদের দোষ কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী।

রামব্রহ্ম। বাঃ, আমরা কি করবো, আমাদের দোষ তুমি কিসে দেখলে?

মধু পণ্ডিত। তোমাদের মানে শুধু তুমি নয় এই তোমাদের মত বাবু-ভেয়ে, ইংরিজিনবিশ, সকলকেই বলচি।

রামব্রহ্ম। দেখ, তুমি যাই বল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরাই আমাদের দেশটিকে মাটি করে দিল। ভাল কাজে কোন উৎসাহ দিবেন না, শাস্ত্রের কথা কাহাকেও বুঝাবার চেষ্টা করবেন না, কেবল কোণে বসে বসে নস্য টিপবেন, আর লোককে গাল পাড়বেন, আর কিসে লোকের জাত্ মারবেন তারই চেষ্টা। নিজের

ছেলের বেলায় মাকড় মারলে ধোকরের ব্যবস্থা, অন্য লোকে ফড়িং মারলে ৫২ টাকার প্রায়শ্চিত্তের ফন্দ! এসব লোকে চিরকাল সহ্য করবে কেন? দেশের ছোটলোকগুলো তো ক্ষেপে উঠেছে। তারা আর ব্রাহ্মণকে মানবে না। মানবেই বা কেন? কেবল তাদের কোণ-ঠেসা করে রাখলে তারা শুনবে কেন? আজ কাল ইংরাজের রাজত্ব, লেখাপড়া একটু-আধটু সকলেই শিখচে, সকলেরই চোখ ফুটেচে। এখন কি আর সংস্কৃত শোলোক আওড়ালেই লোকে মানবে?

মধু পণ্ডিত। শুন, শুন, বৃথা চেঁচিও না। মুখে যা আসচে তাই বলে যাচ্চ দেখচি। শুধু বক্তৃতা করলেই তো হবে না। বুঝে বলা চাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দোষ নেই, তাতো বলচি না; কিন্তু এ দোষটুকু ছিল না, তোমরাই ঘটিয়েছ। আগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা পয়সাকে গ্রাহ্য করত না। পয়সার প্রয়োজনও খুব বেশী তাদের ছিল না। অন্নের জোগাড় ছিল, মোটামুটি আচ্ছাদনও মিলে যেত। এখন তোমরাই ইংরিজি পড়ে চাল বাড়িয়েছ। আগে বড়লোক রাজা-রাজড়া যেমন ভাবে থাকতো, তোমাদের চুনো-পুঁটি সকলই এখন সেই ভাবে থাকিতে চায়। সকলেরই ভাল

কাপড় চাই, ছাতা চাই, জামা চাই, গন্ধ দ্রব্য চাই, তেল চাই, জুতা চাই, ঘড়ি-চেন চাই—গাড়িজুড়ি হলেই ভাল হয়! তার উপর স্ত্রীর বসন ভূষণ তো আছেই! অবশ্য ঈশ্বরকৃপায় তোমরা দশ টাকা রোজগার করচ, কিন্তু তোমরা কে কয়জনে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, দেব-সেবা, সাধু-সজ্জনের সেবা বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে সাহায্য করে থাক? আগে টাকা হলে লোকে এই সব কাজ করে টাকার সদ্ব্যবহার করত। তোমরা যা পাও আপনাদের জন্যেই তা ব্যয় কর, নিজের নিতান্ত প্রতিবেশীর পানেও একবার ফিরে তাকাও না। পূজা-পার্ব্বণ ত উঠে যাচ্চে, এখন যা কিছু তা স্ত্রী-পুত্রের পূজাতেই ব্যয়িত হচ্চে। মা-বাপের শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত করবে না, করলেও যত রেজাটে দুনিয়ার ওঁচা জিনিষ, তাই দিয়ে কাজ সারবে। তাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চলে কি করে, তা ভেবে দেখেছ? তা ছাড়া আর একটা ভয়ানক অপকার সমাজের তোমরা করচ! রাজারাজড়াদের যে চাল-চলন ছিল, তা তাঁদের রাজপ্রাসাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, সাধারণ লোকের মনোযোগ সে দিকে বড় আকৃষ্ট হত না। কিন্তু নিতান্ত প্রতিবেশীর চালচলন

পর্য্যন্ত রাজারাজড়াদের মত হলে, সে কতক্ষণ ছেলে-পিলে মেয়েছেলেদের দৃষ্টিকে এড়ায় বল? তাই দীনের কুটীর হইতে ধনীর অট্টালিকায় পর্য্যন্ত অভাবের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। এ জ্বালা থামাইবে কে? তাই সব লোক—ধনী দরিদ্র সকলেই পতঙ্গের মত সেই অগ্নিতে আসিয়া ঝাঁপ দিতেছে! এদিকে দেশে ঘি, দুধ, জল, বিশুদ্ধ পাবার উপায় মাত্র নাই, দেশের পুকুর-দীঘিগুলো বুঁজে গেল, সে দিকে দৃষ্টিমাত্র নাই, অথচ সকলেই দেশহিতৈষী, সকলেই জননায়ক! আর তোমরা সকলেই আজকাল একটা ধূয়া ধরেচ, আমরা—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাই সমস্ত অনর্থের মূল। অন্য সকল জাতকে ঘৃণার চক্ষে দেখা আমাদেরই কুমন্ত্রণা। জোর করে অনেক লোককে আমরাই নাকি অস্পৃশ্য করে রেখেছি! সেটা সত্যই কি আমাদের দোষ, না তোমাদের শিক্ষার দোষ, ভেবে দেখ দেখি? চিরদিনই তো ব্রাহ্মণেরা সকল জাতির গুরু। তাঁরা দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতিকে বেদ পড়াইতেন না বটে, কিন্তু সকলকেই তো পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত হইতে নানা আখ্যায়িকা, নানাভাবে লোক-

শিক্ষার জন্য ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন, তাহা কি জান না ? দেশে কথকতার সৃষ্টি কে করিল ? কেন করিল ? তা কি জান ? বেদই না হয় তাঁরা পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তীর্থযাত্রা, দেবার্চ্চনা, মন্ত্র-গ্রহণ সকলের জন্যই তো বিধান করিয়াছেন, কাহাকেও তো বাদ দেন নাই। কেন, অতি নীচ লোকও আমাদের দেশে ধর্ম্মভীরু তা কি জান ? যে সমাজের নিম্নস্তরে দণ্ডায়মান, সেও কেন ভগবৎ-প্রেমপ্রার্থী হয় ?—দেবালয়ে মস্তক নত করিয়া থাকে ? ব্রাহ্মণের কাছে, পিতার কাছে শিশুর মত করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকে ?—না সেই সকল সর্ব্বলোক-হিত-কামী ব্রাহ্মণেরা সকলেরই মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও আমরা সেই বিশালদ্রুমের সুশীতল ছায়া উপভোগ করিতেছি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বৃক্ষ আর ফলসমন্বিত না হউক, কিন্তু ছায়াদানে এখনও বিরত নহে। আমরা বাল্য-কালে দেখিয়াছি, অতি নীচ জাতির প্রতিও আমাদের সদ্ব্যবহারের ত্রুটি ছিল না। বাগ্দি দাদা, হামিদ চাচা, কলু খুড়ো, ও গয়লা জ্যেঠার মত মধুর সম্পর্ক,সকলের প্রাণের সহিত একটি অখণ্ড প্রণয়ের যোগকে

প্রমাণিত করিত। এখনই বরং যাঁহারা ইংরাজি পড়িয়াছেন তাঁহাদের মেজাজ গরম, তাঁরাই বরং দেশের ইতর লোকদের সঙ্গে মিশিতে চান না, মিশিতে পারেনও না। ঠিক সাহেবেরা যেমন আমাদের সঙ্গে মিশিতে পারে না। কোন্‌খানে সে যোগটি ভগ্ন হইয়াছে, আজকাল অনেকেই অন্বেষণতৎপর হয়েছেন বটে, কিন্তু সে যোগকে আর তেমন সরলভাবে কেহই লাগাইয়া দিতে পারিতেছেন না। এ দোষ তবে কাদের? ইংরাজি-শিক্ষিত রোজকারী বাবুদের, না আমাদের মত আজন্ম-দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের?

রামব্রহ্ম। ভায়া, তোমার কথাগুলো যেন নূতন-নূতন ঠেকচে। আমরা ভেবেছিলাম, তোমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাবো, এখন যে, দেখছি "উল্টা বুঝলি রাম!"—আমাদেরই স্কন্ধে দোষ এসে পড়চে! তা যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দাও, এই সাধু-সন্ন্যাসী-গুলোর উপর আমার একটুও বিশ্বাস হয় না। ব্যাটারা ভণ্ডের একশেষ! ঠগ!

মধু। ঠগ কেন? তোমরা তো আর কচি খোকাটি নও! জুয়াচোরকে বিশ্বাস কর কেন?

রামব্রহ্ম। বিশ্বাস না করে করি কি বল? ভেল্কি

দেখিয়ে ভুলিয়ে দেয় যে! এই সে দিন এক ব্যাটা জটা থেকে জল বের করলে! তাদের দলের আর একজন মুখের ভিতর থেকে শালগ্রাম বার করলে, লোকে দেখে অবাক্! মনের কথাগুলো টপাটপ বলে দেয় যে, বিশ্বাস না করেই বা কি করি বল? বিশ্বাস করে কুগ্রহ কাটাবার জন্য একটা অনুষ্ঠান করবো; বল্লে জিনিষ পত্র চাই, টাকা চাই না। একটু বিশ্বাস হলো। তারপর ব্যাটা বল্লে সধবাবস্থায় যে স্ত্রী মরেচে তার হাতের কোন স্বর্ণালঙ্কার চাই। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে তাই বড় ভাজের ১০ ভরি সোণার অনন্তটা এনে দিলাম। ব্যাটা পূজা-টুজা কি করে, ভাঁড়ের গলায় গহনাটা দিয়ে সিঁদুর-টিঁদুর দিয়ে রেখে দিল, বল্‌লে এ রকম তিন দিন থাকবে। প্রথম রাতটা তো নিদ্রাই যাইনি, বেশ সতর্ক ছিলাম। দ্বিতীয় রাত্রেও মধ্যে মধ্যে উঠে দেখেছি, পালায় কি না, কিন্তু পালালো না দেখে তখন কতকটা বিশ্বাস হলো। কাপড় দিলে নেয় না, খাবার দিলে খায় না। বল্লে আমাদের নিষ্কাম ধর্ম্ম। ধরণটা দেখে মনেও তাই হয়েছিল। আমার স্ত্রী সাধুকে অবিশ্বাস করার জন্য কত ভৎর্সনা করতে লাগলেন। তৃতীয় রাত্রে আর

সজাগ থাকিনি। ব্যাটা সেই তক্কে গহনা লইয়া পলাতক! সকাল বেলা খোঁজ-খোঁজ করে কোথাও তার পাত্তা পেলাম না। পুলিশে খবর দেওয়া হলো। এই তিন মাস গত হতে চল্লো, পুলিশেও তার কোন কিনারা করতে পারে নাই!

মধু। তোমরাও যদি ভেল্কিতে ভুলবে, তবে আর অন্যের কি দোষ দিব? ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই, সুতরাং অনুষ্ঠান কি করে করতে হয় জানা নাই। এই দেখ কত অন্যায়। জানা থাকলে তো আর ঠকাতে পারত না। মনগড়া অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করবে কেন?

রামব্রহ্ম। মনের কথা বলে দেয় যে!

মধু। আরে আমার পোড়া কপাল! তাতেই বুঝি সে সাধু হয়ে গেল! মনের কথা বলতে পারা—ও যে একটা বিদ্যা, অভ্যাস করলে তুমিও বলতে পার। এই যেমন ঠিকুজী দেখে কোন্ গ্রহের কি ফল বলা যায়। তা থেকে তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলাও চলে। তেমনি করকুষ্ঠি দেখেও অনেকে ভূত ও ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আবার মুখ দেখেও

অনেকে মনের কথা জেনে নিতে পারেন। এ সবই Science যে!

রামব্রহ্ম। আরে ছাই তা কি জানি? মনের কথা বলে দিল, মনে হলো মস্ত সাধু! বিশ্বাস করে ফেল্‌লাম, তার পরই এই বিপদ্‌!

মধু। প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণকে ঠকাবার জো নেই! তিনি যেমনি "উদাসীনো গতব্যথঃ," তেমনি "শুচির্দক্ষঃ।" আমাদের সঙ্গে কি আর তাঁদের তুলনা হয়? আজকাল সে রকম লোকটি বড়ই বিরল।

শ্যামাকান্ত। এসব আপনাদের গা-জুরি কথা। তাঁদের মতন আর কেউ নেই, এও কি সম্ভব? এত বড় পৃথিবীটার মধ্যে বিবেচনা করুন, ভগবানের আমরাই প্রিয় হলাম, আর সব ছেলে তাঁর গোল্লায় গেল! এও কি কখন হয়? আমরাই খুব ভাল, এটা একটা আমাদের বৃথা গর্ব্ব-মাত্র! আর এতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে!

মধু। ভারতবর্ষ কেন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নয় তা বল আগে শুনি। একটা জায়গা ভাল করে করাতেই ভগবান্‌ খারাপ হয়ে যান নাকি? ইতে বুঝি সাম্য মৈত্রীর একটু ব্যাঘাত হয়—নয়? কি সাম্যটাই বুঝেছ! তোমা-

দের বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! পা-টা যে, পা-ই, সে চলে কত কষ্ট করে; মাথার কিন্তু অত মাথা-ব্যথা নাই, তা কোন দিনতো মাথাটাকে নীচে রেখে পা-টাকে উপরে থারার ব্যবস্থা হয় নাই! এজন্য পাও কখন কার কাছে নালিশ করেছে বলে তো কোন খবর পাই নাই। শুভ্রতুষারকিরীটী হিমাচলের সৌন্দর্য্য-শোভা মানুষের হৃদয়ে অপার পুলকের সঞ্চার করে, তাহার নির্ম্মল জল-বায়ু জগতের হৃত স্বাস্থ্যকে পুনর্জ্জীবিত করে, দুষ্ট রক্তকে শোধন করে, রোগ-বীজাণুকে ধ্বংস করে। আবার বঙ্গদেশে সেই জল-বায়ুই সহস্র-সহস্র লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে। কত গ্রাম, কত পল্লী শ্মশান হইয়া যাইতেছে—এ ব্যবস্থা কেন তিনি করিলেন? দেশের সব অংশই তো তাঁর সৃষ্ট। জল-বায়ুর সমান গুণ রাখিলেই তো বেশ হ'ত। কিন্তু তিনি তো এখানে সে রকম উদারতা প্রকাশ করে সব দেশকে এক করিয়া দেন নাই! ইহাতে কি তাঁকে এক চোখো বলিবে? না স্বভাবকেই ইহার কারণ বলিবে? বাপু হে, সবই এক হইতে পারে না। বৈচিত্র্যই তাঁহার মহিমা! এবং সেই বৈচিত্র্য রক্ষার জন্যই ভারতবর্ষ জ্ঞানভূমি ও কর্ম্মভূমি এবং ভগবানের লীলাক্ষেত্র। সব দেশেই তো

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। কিন্তু বাইবেলের সঙ্গে কোরাণের, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সংহিতার তুলনা হয় কি? হাত কাজের জন্য, পা চলার জন্য, মস্তক বিচারের জন্য; তেমনি নানা দেশ নানা কাজের জন্য হইলেও, জ্ঞানের জন্য, মুক্তির জন্য, ভক্তি-সাধনার জন্য ভারতবর্ষ সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়। ভারতবর্ষে কত অবতার, ঈশ্বরের কত লীলা! অন্য দেশে কয়টি অবতার, কয়টি লীলা তাঁর হয়েছে বল দেখি? অবশ্য প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই নাই। অন্য কথা দূর থাক। পাশ্চাত্য ধর্ম্মাচার্য্যের মুকুটমণি যীশু, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সময়ই তো শত যীশুর আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যান্য যুগের কথা তো ছাড়িয়া দিলাম!

রামব্রহ্ম। আরে তাত বটেই, আমাদের দেশ তো বড় হবেই। সে বিষয়ে আর বলবার কিছু নেই। তবে কি জান ভায়া, ওই সব মন্তর তন্তর শাস্ত্র-টাস্তরের প্রতি আর বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হবেই বা কেন তুমি বল। আমাদের মতনই লোকগুলো সুখ-দুঃখ সমান অনুভব করে, কেবল পয়সা-পয়সা করে ঘুরে বেড়াচ্চে। সেই একদিন হঠাৎ এসে পুঁথি থেকে একটা মন্তর বার করে কাণে দিয়ে গেল,

আর অমনি সে গুরু হয়ে গেল, এখন দাও পয়সা।
এ সব কি আর এখনকার শিক্ষিত লোকে চুপ করে
সহ্য করতে পারে, না টিকিনাড়াদের দু-চারটা সং...
শ্লোক শুনে কারও মন গলে ?

মধু। টিকিনাড়াদের কথায় মন গলে না বটে
কিন্তু জুয়াচোরদের কথায় তো অনন্ত গলে দেখচি
ঠিক হয়েছে, তোমরা যেমন, তোমাদের উপযুক্ত
গুরুও তেমনি জুটেচে !

দীন চট্ট। আজকালকার ইংরাজি লেখাপড়া
জানা সাধুবাবারা খুব চালাক ! তারা
এ সব লোকগুলাকে তো বিদ্যায় বা তত্ত্ব-কথায়
পারবার জো নাই, সে সব বিষয়ে শিক্ষিত লোক
মাত্রই আজকাল শুকদেবগোস্বামীর প্রপৌত্র
এ সব লোককে ঠকাতে হলেই ভেল্কি চাই। শুক
পক্ষীর মত বিদ্যা ত কণ্ঠস্থমাত্র কি না, কাজের
বেলায় সেই ট্যা ট্যা ; কাজে-কাজেই এ সব লোক-
গুলোকে অনায়াসেই ভেল্কি দেখিয়ে ঠকানো যায়।
ভেল্কি না দেখলে কিছুতেই ভুলবে না। আরে বাপু,
তুমি সহরকোটালই হও, আর রাজমন্ত্রীই হও, তোমার
কৃতিত্ব যা, তা তো বিষয় ব্যাপার নিয়ে, অধ্যাত্ম-

জ্ঞানের তুমি কি ধার ধার ? সুতরাং ধর্ম্মব্যবসায়ীগুলি
এই সকল পণ্ডিতমূর্খদের ঠকাইয়া বেশ দুপয়সা
উপার্জ্জন করে। এ সব সাধুদের বেশ দল আছে,
বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। জয়ঢাক পেটাবার জন্য
-দশটা মাহিনা করা লোকও আছে। দেশে দেশে
ওদের এজেন্সি খোলা আছে। সাধারণ লোকে ভাবে
অমুক ঘোষ ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর শিষ্য, অমুক চাটুজ্জে
—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র তাঁর শিষ্য, অমুক সদর
আলা তাঁর চেলা ! আর রক্ষা নেই, সবাই চল্‌লো
তার শিষ্য হতে ! শাস্ত্র দেখা নাই, বুঝা নাই, গুরু-
দেবকে জিজ্ঞাসা করা নাই ! বাপু, ধর্ম্মতো
তোমাদের সখের জিনিষ। করগে আপত্তি নেই।
কিন্তু দেখ যেন, শেষ রক্ষা হয়, শেষে গুরুর নামে
ফৌজদারী না চালাতে হয় ! .

অখিলচন্দ্র। এখন কি আর সে সব দিন আছে
হয় ? বামুন-টামুনদের দ্বারা কোন কাজ হয় না।
গুরু-পুরুতদের দিন চলে গ্যাছে !

দীন চট্ট। গুরু-পুরুতদের কপাল পুড়েছে বটে,
কিন্তু সাধু-বাবাজিদের তো একাদশে বৃহস্পতি দেখছি !
তাকে শাস্ত্র মানা নেই, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে

মন্ত্র নেওয়া আছে! আজকাল এ এক প্রকার রোগের মধ্যেই দাঁড়িয়েছে!

অখিলচন্দ্র। আমাদের বাবাজি মহারাজ বলেন্‌ঃ খাওয়া দাওয়ায় বিচার, অত ছুঁই-ছুঁই করা, ওসব সমূহ অজ্ঞানতা। সকলের মধ্যেই যে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, তা গুরু-পুরুতরা কেউ জানে না। এই যে বীজমন্ত্র "হুং ফট্ স্বাহা' করে, ওর কি কেউ মানে জানে? ওর মধ্যে সব বায়ুর ক্রিয়া আছে শ্বাসবন্ধ করলে তবে ওর অর্থ বোধগম্য হয়। সন্ধ্যা মন্ত্র, যা সাধারণ বামুন-পণ্ডিতে করে, ওতে কিছুই নেই। ও সব কুকুরের প্রস্রাব মনে করে ত্যাগ করে দিতে পার। আসল সার-সত্য যা, তা ব্রহ্ম দর্শন, তা হাতে হাতে দেখে লও!

শ্যামাকান্ত। হাতে হাতে কি হে, শুনচি নগের ভেতর নাকি ইষ্টি দেবতা দেখিয়ে দেয়! ক্ষমতা বটে! লোকটা যাকে যা বলচে, তাই তার হচ্চে মশাই, ক্ষমতাখানা একবার দেখুন। ঈশ্বরের জানিত লোক কিনা, আর টটাটং সব টাকা এসে পড়ছে!

দীন চট্ট। তোমরাও যেমন! ও সব কিছু নয়, ব্যাটা পাকা জোচ্চোর।

শ্যামকান্ত। বলেন কি মশায় ? দেশের মাথা-মাথা লোকগুলো পর্য্যন্ত তার পায়ে লুটিয়ে পড়চে ! বাস্তবিক লোকটা হেজো গেজো নয়। অমন অন্যায় হলে হবে কেন ? তেজ খুবই—একবারে মুখ চোখ থেকে যেন ফুটে বেরুচ্ছে ! যেমন চেহারাটি টক-টক করচে, আজানুলম্বিত মাথায় চুল, বেশ ফ্যাসান করে ফেরানো, দাড়িগুলি মাটি পর্য্যন্ত এসে ঠেকেছে। মশায় বলবো কি লোকটা বিত্তের জাহাজ ! আমাদের গুরু ঠাকুর বলছিলেন ইনি সাক্ষাৎ ব্যাসদেব, কলির জীবের কষ্ট দেখে অবতীর্ণ হয়েছেন ! সে কথা বড় মিথ্যা নয়, রাজারাজড়ারা পর্য্যন্ত কথার প্রতিবাদ করতে পারে না। ঘাড় তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাবে তা সাধ্যি কি ? শুনছি নাকি ষড়্দর্শন যে আমাদের দেশে ছিল, তা কচ কচ করে কেটে দিয়ে সপ্তম দর্শন বার করেছেন ! আমাদের রাজন রাগের জ্বালায় ছট ফট করছিল, তারপর যেমনি তাঁর কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে এসে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরল, তার রোগ যায় কোথায় ! বাবাজি বল্লেন—“যা ব্যাটা তার কোন ভয় নেই। থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে !” এখন তো দেখচি লোকটা “হরিবোলে আমার গৌর

নাচে” বলে নেচে নেচে বেড়াচ্চে। আবার ব্যাপা-
খানা বুঝ দাদা। গা থেকে বাবাজীর ভুর-ভুর করে
গন্ধ বেরুচ্চে—বেল-মল্লিকা যেন আমাদের সামী-
কে ছড়িয়ে দিয়ে গেল! এসব কি আর যেমন
তেমন কাণ্ড! এসব ষট্‌চক্র ভেদ করা যোগ,
বুঝলে কি না, রাজযোগ-টাজযোগ নয়, যেটা সকলের
চেয়ে বড় যোগ তাতেই লোকটা একেবারে ঝুনো।
কোমর এঁটে যখন নিশ্বাস খেঁচে তোলে, তখন কাঁড়
কাঠগুলো মাথায় ঠ্যাকে, চারিদিক্ গম্‌গম্ করতে
থাকে। এদিকে বিষয়বুদ্ধিও বেশ! মকর্দ্দমায় কেমন
করে জয় হবে তা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছেন! তাঁর বাগানে
কত আম হয়েছিল, সেগুলি কোথায় কোথায় চালান
দিলে কত বেশী টাকা আমদানি হবে, সে আলোচনা
চলছিল। আবার এদিকে শিবচক্ষু হয়ে বসে আছেন
কিন্তু টাকার শব্দটি হলেই চম্‌কে উঠেন! ভাই,
জগাদাদা বলছিল গুরুদেবের কোন ইচ্ছা নাই, তাঁর
মন এ জগতে থাকে না। আমাদের উপর কৃপাবশত
কখন কখন বোঁ করে এদিকে উড়ে আসে বইত নয়
তবে যে তাঁকে কথা বলতে দেখ, টাকা গুণতে দেখ
ও সব অনিচ্ছার ইচ্ছা। আমি বল্লাম “অনিচ্ছা

ইচ্ছাটা কি দাদা ?” তিনিও তখন শিবচক্ষু হয়ে বল্লেন—“আছে আছে, ওর ভেতর অনেক কথা আছে ; গুরুদেবের কৃপা হলে ও সব পরে টের পাবে, ও সব গুরুবক্ত্র-গম্য !”

মধু পণ্ডিত। হাঁহে শ্যামাকান্ত, এসব তুমি চোখে দেখে এলে নাকি ?

শ্যামাকান্ত। আজ্ঞা হাঁ, ও এক রকম আমার চোখে দেখাই। গায়ে যে গন্ধ বেরয়, তা আমি নিজেই পেয়েছিলাম। তবে সেটা জগা দাদার পকে-টের রুমালে আতর মাখা ছিল, তার গন্ধ কিনা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বকুলের গন্ধটা ! আবার সময়ে সময়ে বাগা ভেরান্দার গন্ধটা ঠিকই তাঁর গা থেকে বেরুচ্ছিল। আর সব কথা আমি মেজদাদার শালীর কাছে শুনেছি। তিনি মিথ্যা কথার লোক নন। একবারে বালবিধবা—আজ ১৮বৎসর ধরে আলো চাল আর কাঁচকলা চল্‌চে। তিনি বলেন গুরুদেব কলির জীবের প্রতি কৃপা করে ধর্ম্মটাকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, বেদব্যাসের বাবারও তা ক্ষমতা ছিল না। ইনি আর জন্মে নাকি এক মুনি ছিলেন, জীবের কষ্ট দেখে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আর ধর্ম্মটাকে এবং স্বর্গে যাবার পথটাকে খুব সহজ করে দিয়ে যাচ্চেন। গুরুদেব বলেন, "জাত-অজা-তের বিচার নাই কো মোর ঘরে, একবার গৌর বল্‌লে যায় তরে॥"

মধু পণ্ডিত। আরে মূর্খ থাম্! ওসব বলা বড় সোজা। জাত মারতে ঘরের বার করতে তো বেশী কষ্ট নেই; জাত রাখা, ঘরে রাখাই ক্ষমতার কাজ। সে সব বুদ্ধি তো আর তোমাদের নাই। সহজ হলেই হল। আরে পাগল ধর্ম্ম কি সহজ হয়? বড় শক্ত। শক্ত বলেই শাস্ত্র বলচেন "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"। কিন্তু তোমাদের কপি-প্রবরেরা কি আর সে কথা কানে তুলবে? তা বেশ হচ্চে, কালের যা ধর্ম্ম তাই হচ্চে। এখন সকলেই সব জান্তা—সকলেই গুরু। সকলেই শিষ্য করে লোক জনকে ভবসাগরের পারে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। এদিকে নিজে যে গলায় পাথর বেঁধে সাগরে ভেসেছেন, মাঝ দরিয়ায় হাবুডুবু খেয়ে যে প্রাণটা বেরুবে সে খবর নাই। নিজের সম্বন্ধে সকলেই উদ্যোগশূন্য, যেন তাঁরা সকলেই শঙ্করাচার্য্য বা নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার!

অখিল। কি বলেন পণ্ডিতজি, তবে এসব সাধু-টাধু কিছু নয় নাকি ? ইঁহারা যে ভাবে চলতে বলেন, সে সব শাস্ত্রসম্মত নয় তবে ? আমরা তো তা জানি না, আমরা ভাবচি আমরা বুঝি শাস্ত্রসম্মত কাজই করচি।

মধু পণ্ডিত। ভাই, শাস্ত্রসম্মত হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি ? কেউ তো আর সে দিক্ দিয়ে যাবে না। বল্‌লেও সে সব কথা শুনবে না। তা যার যা ভাল লাগে সে তাই করুক।

রামব্রহ্ম। না দাদা, অভিমান করলে চল্‌চে না। আমাদের তো একটা উপায় চাই। আমরা কি করব বল ?

মধু পণ্ডিত। করবে আর কি ভায়া, তোমরা করবে না কিছুই ! একবারে না কর সে বেশ। নাস্তিক হওয়াও ভাল। কিন্তু আস্তিকের সাজ পরে নাস্তিকের হৃদয় নিয়ে তোমরা যে অভিনয় কর, তাতে শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, দেবতা ও আচার্য্য সকলেই যেন লজ্জায় মাথা তুলিতে পারেন না। তোমরা ভণ্ডামিগুলো ছাড়তে পার ? তোমরা যদি ভণ্ডামি ছাড় তবে ঐ ভণ্ড স্বামীগুলিরও আমদানি কিছু কম হয়। দেশের ধর্ম্ম বাঁচে। লোকস্থিতি হয়।

অখিল। আপনি কি বলচেন ? আমাদের স্বামীজি যে প্রকাণ্ড পণ্ডিত, একবারে Studentship পাশ। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব-বিবিগুলো পর্য্যন্ত পায়ে লুটিয়ে পড়চে! গুরুদেবের অপার মহিমা, কেবলং সত্যং—গুরুপাদপদ্মং।

দীনুচটু। যা, যা তুই আর ভণ্ডামী করিস্ নে বাপু। তোদের গুরুর হদ্দমুদ্দ সবই জানি।

রামব্রহ্ম। বিলাতের লোকেরা পর্য্যন্ত তাঁর লেকচার শুনিবার জন্য ব্যাকুল। বিলাত যাবার জন্য কত তাগিদপত্র আসচে। স্বামীজি সেগুলি বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিয়েছেন। আর একটু ভাল-কাপড়-জামা-পরা লোক দেখলেই তাকে সেইগুলি খুলে খুলে দেখাচ্চেন। আবার এটুকুও বলচেন আপনারা এসব কাকেও বলবেন না। আমি আত্ম প্রশংসা শুনতে ইচ্ছা করি না। আপনারা দুই এক জন অন্তরঙ্গ, তাই আপনাদের গোপনে এসব দেখালাম। না, বাবাজির লেকচার দিবার ক্ষমতা আছে। লোককে মুগ্ধও করিতে পারেন।

মধু পণ্ডিত। আমি তো কারও ক্ষমতা কমের কথা বলচি না। দেশের ও নিজেদের দুরদৃষ্টের কথাই

ভাবচি।• বিলাতের সম্মানই তবে তোমাদের মতে সব চেয়ে বড় সম্মান হলো?

অখিল। আহা! তা কেন হবে? তবে কি জানেন, অক্সফোর্ড-ইউনিভারসিটির দিগ্‌গজ পণ্ডিত-গুলো পর্য্যন্ত ওঁর লেকচার শুনে মুগ্ধ। ওঃ, গোটে গোটে সাহেব-মেম সব শিষ্য হয়ে পড়চে! লেকচার শুনে হতভম্ভ! কি যে স্বরূপ সত্তা, আর অরূপ সত্তা, লোগাস্ আর কস্‌মস্ করে কি বলেন, শুনে ব্যাটাদের পাগুলো যেন পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়, আর টুঁ-টি করতে পারে না। আমাদের নীলু ঠাকুর—যিনি সকলের টিকি কেটে বেড়ান. তিনিও তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ। বলছিলেন লোকটা যেন দত্তাত্রেয়।

মধু পণ্ডিত। আমাকেও তবে তাঁর কাছে দীক্ষাটা দিইয়ে দাও ভবসাগরটা যদি এক লম্ফে পার হয়ে যেতে পারি।

রামব্রহ্ম। ভায়া কি বলচ, ও সব কথায় কাণ দাও কেন? তুমি তো আমাদের দেশের শিরোমণি। তা হলে কি হবে? গেঁয়ো যোগী কি আর ভিখ পায়! তবে তোমাদেরও দোষ আছে—তাও বলি! রাগ করো না। তোমরা যারা পার তারাও তো

কিছু চেষ্টা করবে না! তোমাদের মত প্রতিভা-সম্পন্ন সাধনশীল পণ্ডিতরাও যদি কোণে চুপ করে বসে থাক, তবে লোকে বুজরুকের পাল্লায় পড়ে ভেল্কি দেখে ভুলে যাবে না কেন?

মধু পণ্ডিত। বুঝাব কাকে বল! "সাচ্চা বোলে তো মারে লাট্টা, ভেক জগৎ ভুলায়। গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়॥" যারা মিথ্যা বলতে জানে তাদের কথাতেই তোমরা ভুলবে। আর আমরা সত্য কথা বলতে গেলে মারতে আসবে। যেনে শুনে ভণ্ডগুলার মত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলা কি ভাল? ভণ্ডামি করাটা আমার ধাতে সয় না বাপু! পরকাল তো আছে। আর বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানের কথাটাও যে ভুলতে পারি না। সুতরাং—

রামব্রহ্ম। সুতরাং আবার কি? আমাদের নির্ভাবনায় তুমি বলে যেতে পার। আমি তো এখনি তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত।

মধু পণ্ডিত। না ভায়া আমি গুরু-টুরু হতে পারব না। ও যার কাজ তারে সাজে। তবে এ সব ভাল কথা যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। আমি কিন্তু বাপু, মন-গড়া কথা বলতে পারব না! শাস্ত্রানুকূল ধর্ম্মানুষ্ঠানই

আমার অভিমত। রাতারাতি ঋষি বা অবতার বনে যেতে আমার আগ্রহ নেই। সুতরাং নিজে গুরু না হয়ে ব্যাস-বশিষ্ঠকেই বন্দনীয় গুরু বলেই স্বীকার করে থাকি। তাঁদের মতকেই অভ্রান্ত বলে মনে করি। এখনকার হংস-টংসর প্রতি আমার বড় আস্থা নাই।

রামব্রহ্ম। দাদা এটা কিন্তু তোমার গোঁড়ামি। কেন, তোমার মুখেই তো কত উদার ভাব পূর্ব্বে শুনেছি। এখন আবার বিগড়ে বসলে কেন?

মধু পণ্ডিত। ওই ত তোমাদের দোষ, এই জন্যই কিছু বলতে চাই না। শাস্ত্র মেনে চলতে বল্লেই তোমাদের মতে গোঁড়ামি হলো। শাস্ত্র মানতে হলেই যেন তোমাদের যম-যাতনা হয়। ঠিক আগে-কার অসুরগুলোর এই রকম হতো।

রামব্রহ্ম। আচ্ছা, আমরা তো অসুরই বটি, তুমি এইবার অসুরদলন কর দেখি!

মধু পণ্ডিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান করতে হলেই শাস্ত্র মানতে হবে, কারণ শাস্ত্রই ধর্ম্মের ধারক ও ব্যাখ্যাতা। শাস্ত্র আমাদের মত মানুষের সৃষ্ট নয়। শাস্ত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁরা ঋষি, তাঁরা আপ্ত, তাঁরা সব অভ্রান্ত পুরুষ। তাঁরা এ কালের ঋষি তপস্বী নন। রাজা

রামমোহন রায়ও নন, তোমাদের রামানন্দ শ্যামা-নন্দ, দয়ানন্দ বা বিশুদ্ধানন্দও নন। তাঁরা বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইয়া প্রজ্ঞা-চক্ষে যে সত্যের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন, তাহাই জগতের কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন।

অবশ্য মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুই চারটা মনগড়া নূতন শ্লোক তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু সিদ্ধ-সাধকের কাছে সে সব কারচুপি ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না। নিজে এই জন্যই শাস্ত্র পড়তে নাই, গুরুমুখে শুনতে হয়। এইজন্য বিদ্বান্ ও সাধক-শ্রেণীর লোকেরাই গুরুরূপে মনোনীত হইতেন। এখনকার মত বার্ষিক-কুড়ানো গুরু তাঁরা নন! ধর্ম্ম অনুষ্ঠানগত পুঁথিগত বা বাক্যগত নহে। সেই জন্যই ধর্ম্মকে যাঁরা ধারণ করেছিলেন এবং এখনও ধারণ করে আছেন, সেই সকল অমোঘবীর্য্য তপোনিষ্ঠ সাধনতৎপর জ্ঞান-বিজ্ঞানপারদর্শী ঋষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র ও ব্যাখ্যাকে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেই হইবে। ইহাই ধর্ম্মসাধনের প্রথম সোপান। অত্যন্ত উদারতা দেখাইতে গিয়া ধর্ম্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া নিজের মনোময়ী কঙ্কালমূর্ত্তি গড়িতে যাইও না।

গড়িতে ত' পারিবেই না, বরং যাহা আছে তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে। মনু বলেন—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥"

শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত আচার পরম ধর্ম্ম। অতএব আত্মবান্ অর্থাৎ মনস্বী দ্বিজগণ শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত এই আচারের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেন। আচারবিহীনের ধর্ম্ম হয় না। মনু বলিয়াছিলেন—

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥"

আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন না, কিন্তু যদি তিনি সদাচারসম্পন্ন হন তাহা হইলে বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন।"

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে ॥"

পিতৃপিতামহাদি যে পথ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ কর্ত্তব্য এবং তাহাই সৎপথ; সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে না।

রামব্রহ্ম। এই তো ভায়া এইখার মুস্কিলে ফেল্‌লে। মন্ত্র-ফন্ত্রকে মানতে গেলেই তো সমস্ত বিপদ্‌! মন্ত্রর মধ্যে অনেক গোঁড়ামি ও গাজুরী কথা আছে। এ সব কি আর আজ কালকার কালে কেউ কাণে তুলবে?

মধু পণ্ডিত। মন্ত্রর মধ্যে গোঁড়ামি কি দেখলে?

রামব্রহ্ম। কেবল সবই ব্রাহ্মণকে দাও, আর শূদ্দুর ব্যাটাদের দিয়ে পা টেপাও, এই তো মন্ত্রর কথা। ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে লঘু দণ্ড, সেই অপরাধ কোন শূদ্র করিলে আর ব্যাচারির রক্ষা নাই। তার জন্য ভয়ঙ্কর গুরুদণ্ড বিহিত। কোন অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য দেশেও সেরূপ দণ্ডের বিধান নাই! তারপর আর একটা অত্যাচারের কথা শুন। শূদ্র তো বেদ পড়িতেই পাইবে না, যদি শোনে তবে তপ্ত সীসা তার কাণে ঢেলে দিতে হবে! কি আরাম! তারা কি ভগবানের সৃষ্ট নয়? তারা কি বাণে ভেসে এসেছে নাকি? এ রকম মনুষ্যকে অপমান বোধ হয় কোন দেশে কোন জাতিতে আর কেহ কখন করে নাই। তথাপি পিতৃপুরুষের গৌরবে আমাদের মাটিতে পা পড়ে না, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ জাতিকে তো ম্লেচ্ছ

করে কোণে ফেলে রেখেছি! ইহার ফল কি ভুগিতে হইবে না তাহা ভাবিতেছ! যিনি সকলের পিতা, এ অপমান কখনও তিনি সহ্য করিবেন না। আমরা যে পরপদানত, আমরা যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতেছি, সবই এই পাপের ফল! তোমার মনুর পায়ে দণ্ডবৎ। আর এই যদি তোমার "সতাং মার্গং" হয়, তবে সে মার্গে আমার যেয়ে কাজ নাই, তার চেয়ে ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খেতেও আমি সম্মত আছি।

মধু পণ্ডিত। অত চট কেন বাপু? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন? কি বল্লাম আর কি বুঝলে? আচ্ছা, তোমার কথাটারই মীমাংসা হয়ে যাক। শূদ্রকে বেদে অধিকার দেন নাই, এইত? আগে আমার কথাটার উত্তর দাও পরে এ কথার উত্তর দিচ্চি! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তোমাদের স্বায়ত্ত-শাসনে অধিকার দিচ্চেন না কেন? না তোমরা অনুপযুক্ত বলে!

রামব্রহ্ম। ও একটা তাঁদের অছিলা। যাই হ'ক, ও সব রাজনৈতিক কথায় আমাদের কাজ নাই! ধরিয়া লওয়া যা'ক যে আমরা অনুপযুক্ত বলেই

সরকার বাহাদুর আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দেন না, কিন্তু উপযুক্ত হলেও আমরা পাব না, একথা তাঁরাও কখন বলেন না। কিন্তু আমাদের দেশের শূদ্ররা কোন জন্মে যে ব্রাহ্মণের অধিকার পাবে, এ কথা শাস্ত্রে বলে না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বলেন না। শূদ্রের ঘরে জন্মেছে, সুতরাং ভাল লোক—ধার্ম্মিক লোক হলেও তাকে শূদ্রই থাকতে হবে, এর অন্যথা যে করতে যাবে সে ধর্ম্মদ্রোহী হবে। এইত আমাদের শাস্ত্র!

মধু পণ্ডিত। উপযুক্ত হলে অধিকার দেওয়া হয় না, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে? মানবের যোগ্যতানুযায়ী অধিকার লাভ শাস্ত্র স্বীকার করেচেন।

রামব্রহ্ম। কিন্তু এ জন্মে নয়, পর জন্মে অধিকার লাভ করিবার কথা আছে।

মধু পণ্ডিত। তা'ত আছেই। তা' ছাড়া অত্যুগ্র তপস্যারপ্রভাবে এ জন্মেও সে অধিকার লাভ করা যায়। বিশ্বামিত্র তো ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এই জন্মেই।

রামব্রহ্ম। আপনাদের নাড়ন চাড়ন ওই এক বিশ্বামিত্রকে লইয়াই! আর তো নাই?

মধু। কেন? শাস্ত্রে বৈশ্য ঋষি, শূদ্র ঋষিরও অনেক নাম আছে। যোগ্যতা থাকিলেই যোগ্য অধিকার লাভ হইবে এই তো সনাতন প্রথা। উচ্চতর অধিকার লাভ করিতে যোগ্য হইলেও ইতর বর্ণের একটু হাঙ্গাম পোয়াইতে হয়, একটু বেগ পাইতে হয়।

রামব্রহ্ম। যিনি যোগ্যতর, তাঁহাকে হাঙ্গামই বা পোয়াইতে হইবে কেন?

মধু। হাঙ্গাম এই জন্যই হয় যে, পাছে যোগ্যতার ভাণ করিয়া অযোগ্য ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশ লাভ করে একটু হানাহানি হয়ে পরীক্ষা হয়ে যায়, ইহাতে আর দোষ কি? তোমাদের বিলাতের মহাসভাতেও তো নেতৃত্ব ও সদস্য নির্ব্বাচন লইয়া খুবই বাদানুবাদ ও হাঙ্গাম হয়। অবশেষে অধিকাংশ লোকের মতে যিনি যোগ্যতর তিনিই মনোনীত হন। তবে যাদের যেটায় খাস অধিকার সে অধিকারটা অন্যকে দিতে হলে একটু মর্য্যাদা ও স্বার্থ বুদ্ধিতে আঘাত পড়ে।

রামব্রহ্ম। তা না হয় হ'লো। কিন্তু অনেক অযোগ্য ব্রাহ্মণও যে ব্রাহ্মণের দলে স্থান পাচ্চে, আর

অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত, তবু তার সমাজে একটু উচ্চতর স্থান লাভের আশা নাই, এ কেন হতে পারে ?

মধু পণ্ডিত। সমাজ বেঁচে নাই তাই। এ জাতি যদি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় না থাকিত, তবে তাহা হইত কি না দেখিতে ? এ কালে কেই বা কাকে গ্রাহ্য করে, কেই বা সমাজকে সম্মান করে। মাথা না থাকিলে যে দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে।

রামব্রহ্ম। তাই যদি সমাজের এতই দুর্দ্দশা হয়ে থাকে, তবে সেই মৃত সমাজটাকে লইয়া এত আস্ফালন করা কেন ? ইচ্ছা ও সুবিধা মত যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক না কেন ? মৃত সমাজ-সর্পের ভয়ে অনেক মঙ্গল কার্য্য যে আটকাইয়া রহিয়াছে !

মধু পণ্ডিত। যাহার যাহা খুসি সেই মত করিলে এ পৃথিবী যে নরকে পরিণত হইবে, মনুষ্যের বস-বাসের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বিস্মৃত হইতেছ কেন ? তা ছাড়া, পুরাতন প্রথা-মত সব বর্ত্তমান যুগে হইতেছে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে কয়টা

হইতেছে তাঁহাও উঠাইয়া দিয়া লাভ কি? যদিও কর্ম্ম সম্পূর্ণ না হওয়ায় ফলহানি ঘটিতেছে, তথাপি এই সকল জীর্ণ ত্যক্ত অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা এখনও আমরা পূর্ব্ব পুরুষদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছি। অসম্পূর্ণ বা বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া যদি আমরা তাহাও ছাড়িয়া দিই, তবে আর সেই প্রাচীন ঋষিকুলের সহিত আমাদের ক্ষীণ সংযোগ-রেখাটিও যে বিলুপ্ত হইবে। আমরা যে তাঁহাদেরই সন্তান একথা অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে সকলের চিত্ত হইতে তাহা মুছিয়া যাইবে। এরূপ আত্মঘাতী হইবার প্রবৃত্তি, ভগবান্ করুন, যেন আমাদের না আসে। আমাদের এখনও ভরসা আছে যাহারা আমাদের মধ্যে সেই অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান-গুলিও পরমশ্রদ্ধারসহিত প্রেমের সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ভক্তিই আবার সেই সুপ্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় সাধনাগুলির মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ের সুকোমল সরল ভক্তি-প্রেমমণ্ডিত ভাব সূত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া আবার এই ভারতবর্ষের কল্যাণবিধান করিবেন।
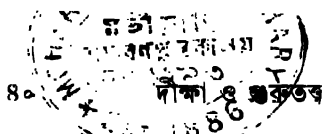
আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণধর্ম্মের ও সচ্চরিত্র সাধু ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইবে। আবার ধর্ম্মের আলোকে ভারতবর্ষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। আবার ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা-ভক্তির সুনির্ম্মল মলয়বায়ু ভারতের উত্তপ্ত-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর চিত্তকে সুশীতল করিয়া দিবে। এ সম্ভাবনাকে আমি কখনও দুরাশা বলিয়া মনে করি না।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণ-দিগের অভিমত লইয়া অনেক অনাচরণীয় জাতিকে আচরণীয় করিয়া লইয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণেতর জাতি যেমন তপঃপ্রভাবে ঋষিত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, তেমন অনেক আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তানকেও পতিত করিয়া রাখা হইয়াছে। সে চিহ্ন সমাজে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়! তবে তপস্তেজঃ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণসন্তানের যতটা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা ততটা অন্য জাতির নহে, কারণ জন্মগত সংস্কারের প্রভাব তো কম নহে। কর্ম্মকারের পুত্র কর্ম্মকারের কর্ম্মে, বৈদ্যের ছেলে চিকিৎসা ব্যবসায়ে, বেণের ছেলের ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবং কায়স্থ সন্তানের হিসাব-পত্রে যতটা পারদর্শী হইতে দেখা যায়, এমন অন্য

কাহাকেও বিরল দেখা যায়। সুতরাং কোন একটা ব্যবসাতে একটা পুরুষপরম্পরাগত চেষ্টায় যে সমধিক ফল লাভ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্যই এক-একটি ব্যবসা এক একটি জাতির জাতিগত ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রকার ব্যবস্থা জাতীয় ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতি সাধনের পক্ষে ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ একটি বিশেষ জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কর্ম্ম ও চেষ্টা প্রভাবে সমাজের সমস্ত প্রাচীর বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনার সমুন্নত শিরকে আরো উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হন, তবে তাঁহাকে স্থান ছাড়িয়া দিবে না কে ? আজও যবন হরিদাসকে স্মরণ করিয়া কাহার মস্তক নত না হয় ? কেহ বা নীচকুলোদ্ভব রুইদাস ও ম্লেচ্ছ কবীরকে ভক্তিপুষ্পে পূজা না করিয়া থাকে ? বাল্মীকি ব্রাহ্মণ-পুত্র হইয়াও যখন পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেন, তখন কেইবা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিত ? আর যখন সেই দস্যু রত্নাকর তস্করবৃত্তি পরিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বকলঙ্ক ধৌত করিয়া ভারতের কবিতারসাম্রকাননে প্রথম

কোকিলরূপে দেখা দিলেন, যখন বিরহবেদনাক্লিষ্ট ক্রৌঞ্চবধূর বিলাপধ্বনি তাঁহার কোমল হৃদয়ে করুণার অনন্ত উৎস ফুটাইয়া তাঁহার অতীত জীবনের সমস্ত কালিমা মুছাইয়া দিল, তখন কে তাঁহার দস্যু জীবনের হীন প্রবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এই পবিত্র স্মৃতিকে অনাদর করিতে সমর্থ হয় ? সে সকল কথা যাক্। বেদ-শ্রবণে শূদ্রদের কর্ণে তপ্ত সীসক ঢালিয়া দিবার যে কথা আছে তাহাতেও কোন কু অভিপ্রায় নাই। অযোগ্য ব্যক্তি না বুঝিয়া পাছে বেদের মর্য্যাদা হানি করে, এই জন্যই বেদ শুনিতে মানা। ওসব কথা কাণে শোনাও মানা। কাণে শুনলেই মনে হবে করে দেখি। কিন্তু সে যোগ্যতা তো জন্মে নাই, অনর্থক উভয়-বিভ্রষ্ট হইয়া জন্ম-জন্মান্তর নষ্ট করিবে, আপনার সুতরাং সমাজেরও ঘোরতর অমঙ্গল সাধন করিবে, এই জন্যই এত কঠিন শাসনের ব্যবস্থা। এক রাজার গল্প বলি শুন। রাজা গুরুর কাছে প্রত্যহ বেদান্ত শ্রবণ করেন। জ্ঞান-শাস্ত্রের চরম গ্রন্থই বেদান্ত। সুতরাং গুরুদেবের কাছে রাজা অন্য কোন শাস্ত্র না শুনিয়া বেদান্তই শ্রবণ করেন। বেদান্ত শুনিয়া

'সকলেই সমান' রাজার এই ধারণা জন্মিল। সেই সিদ্ধান্তে তিনি গৃহস্থিতা সুন্দরী বিধবা কন্যাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ পত্নীকে জানাইলেন। পত্নী শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং রাজার জেদ দেখিয়া উপায়ান্তর না পাইয়া গুরুকে ডাকাইয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। গুরু দেখিলেন তিনি অযোগ্য ব্যক্তিকে জ্ঞানের উপদেশ করিয়া অতিশয় মূঢ়ের কার্য্য করিয়াছেন। অজ্ঞানী বা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির যদি এইরূপ লোকবিধ্বংসী ঐক্য জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে পৃথিবী নরক হইয়া উঠিবে কিনা, সেই জন্যই এত বিধি—নিষেধ এবং কঠোর শাসনের ব্যবস্থা। "উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে," মূর্খ বা অযোগ্য ব্যক্তিকে উপদেশ দিলে তাহার চিত্তবৃত্তি তো উপরম লাভ করে না, বরং ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায়। উপদেশ লাভ করিতে হইলেই যোগ্যতা লাভ করিতে হয়, নচেৎ শুধু উপদেশে কোন ফল হইবে না। যোগ্যতা লাভের জন্যই সাধনার প্রয়োজন। সাধনার সোপান-পরম্পরায় আরোহণ করিয়া উচ্চতর শিখরে উপনীত হইলে তবেই উচ্চতম জ্ঞানে অধিকার জন্মে। তখনই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা

অভীষ্ট ফলদায়ক হয়। নচেৎ যাহা শুনিলাম, তাহা বুঝিলাম না, যাহা বুঝিলাম তাহা করিলাম না; এইরূপ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়া পশুভীত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিলে ইহ-পর প্রনষ্ট হইয়া যায়। নিয়মের কঠোরতা এবং অনুষ্ঠানের জটিলতার মধ্য দিয়াই যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। যোগ্যতা লাভ হইলে গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয় এবং তাঁহার উপদেশ-বাক্যও ধারণা করা সহজ হয়।

রামব্রহ্ম। আচ্ছা ভায়া, স্ত্রী-শূদ্রের বেদে বা প্রণব মন্ত্রে অধিকার নাই কেন?

মধু পণ্ডিত! বেদ মানে বুঝতে তোমরা ভুল কর। "ন বেদং বেদ-মিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনঃ। ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ॥" সনাতন ব্রহ্মই বেদ, এই বেদকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ। সুতরাং এ বেদকে যাঁহারা জানেন না তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন কিরূপে? "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' —ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই হন। তাই ব্রাহ্মণের পদ-রজের এত মহিমা?

কবি ৺দাশরথি রায় যথার্থ বলিয়াছেন—

'মম মানস সদা ভজ দ্বিজচরণপঙ্কজ ;

দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ''—

"ভবরোগ অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি তায় জানে বিধি,

এরোগেরও মহৌষধি ব্রাহ্মণের পদরজঃ।"

ভাগবতেও সেইজন্য বলিয়াছেন—

"মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

এ বেদ পড়িলেই হয় না। যদি শব্দই কেবল-মাত্র বেদ হইত, তবে এ বেদ সকলের পড়িতে ভয় কি ? কিন্তু এ বেদের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিন্ন জানিবার অধিকার কাহারও নাই এবং বেদের মূল যে প্রণব মন্ত্র তাহা মুখে উচ্চারিত হইবার নহে। সাধারণে তাহা যেরূপে উচ্চারণ করে, সেরূপ উচ্চারণ করা তো কিছুমাত্র কঠিন নহে। কিন্তু এ সে শব্দ নয়—"আকাশস্য গুণঃ শব্দঃ"— আর এ নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে।" তবে এ কিরূপ শব্দ ? এ

"অনাহতস্য যঃ শব্দস্তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।

ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি র্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।

তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণববাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

এই শব্দ যে স্থান হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহার মধ্যে শব্দকে অনুসরণ করিয়া মন প্রবেশ করিলে বিষ্ণুর পরম পদকে লাভ করে।

ব্যর্থ চেষ্টায় কোন ফল নাই। যেখানে ফললাভের সম্ভাবনা সেইখানেই পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। যে মস্তিষ্কে ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করিবে না, সেখানে জ্ঞানের উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেই জন্যই সাধারণত স্ত্রী-শূদ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবার নিষেধ আছে। কিন্তু যেখানে যোগ্যতা আছে সেখানে বলিতে তো হানি নাই। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তো মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন। গার্গী, সুলভা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী কন্যার বিষয় কে না অবগত আছেন? সীতা সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ~~?~~ যাহা স্বামি সেবার মধ্যে স্ত্রীর যে ধর্ম্মানুশীলন হয় তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ সাধনার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়া-

ছেন—"তস্মাৎ জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।" এই একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য দ্বারাই সাধ্বী স্বামীর মধ্যে জগৎ-স্বামীকে উপলব্ধি করেন। যেমন নিম্ন অধিকারীর প্রথমে প্রতীকের উপাসনা করিতে হয়, সেইরূপ স্ত্রীর অন্য রূপ পূজার অপেক্ষা একমাত্র স্বামীতে অটলপ্রতিষ্ঠা হইয়া তাঁহার সেবা করায় দেব-উপাসনার ফল লাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর পক্ষে "যথা দেবে তথা গুরৌ" গুরুকে ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞানে ভক্তি করিতে হয়। স্ত্রীরও তদ্রূপ স্বামীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-বোধে পূজা করা উচিত। পরে যিনি শরীরবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, মন যাঁহার অনন্ত শান্তিনিলয়ের নিত্য নিবাসে স্থিতি লাভ করিয়াছে, সেই স্ত্রীর চিত্ত তো ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করিয়াছে, সে তো জন্ম-মরণের পর পারে, পর আপনার স্ত্রী-পুরুষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভেদ বুদ্ধির পর পারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রামব্রহ্ম। দেখ আর একটা খটকা হইয়াছে, ভগবানের কাছে তো সবই সমান, তবে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ করিলেন কেন?

মধু পণ্ডিত। কেন করিলেন, তা তিনিই

জানেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র কেন, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, জীব-জড় ভেদ, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সুরূপ-কুরূপ মূর্খ-পণ্ডিত, অনন্ত ভেদ জগতে বর্ত্তমান। ভেদেই বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যই জগতের বিশেষত্ব। বৈচিত্র্যই তো সৃষ্টির মূল। সৃষ্টির প্রথমে যখন "একোঽহং বহু স্যাম্" এই ভাব ব্রহ্মেতে জাগিল তখনি প্রকৃতি চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। যে গুণত্রয় সমতা লাভ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন ছিল, তাহারা চাড়া দিয়া উঠিল। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্ভবৌ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার এক কালে গাঢ়

তমসাচ্ছন্ন ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়, কোন লক্ষণা দ্বারা অনুমেয় নয় ; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া, সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন। যিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত সনাতন, সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্যপুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হইল। এ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন।

ব্রহ্মা তারপর সত্ত্বরজস্তমো গুণময় মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার এবং মনের সৃষ্টি করিলেন। তারপর বিষয়গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিলেন। তার পর অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টির

পঞ্চভূত অবয়বকে তদীয় বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া তিনি দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন। সাধারণতঃ সত্ত্বগুণ হইতে দেবতা, রজোগুণ হইতে মনুষ্য এবং তমোগুণ হইতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ প্রস্তরাদির উৎপত্তি হইল। প্রত্যেক গুণের মধ্যেও অপর দু'টি গুণ মিশ্রিত আছে। মিশ্রণ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। এই জন্য দেবতারা সত্ত্বগুণ হইতে জাত হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও আবার সত্ত্বপ্রধান রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান দেবতা আছেন। মনুষ্যেরা সাধারণতঃ রজঃপ্রধান হইলেও সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু ব্রাহ্মণ, রজোগুণের আধিক্যহেতু ক্ষত্রিয় এবং রজস্তমের মিশ্রণে বৈশ্য ও তমঃপ্রধান শূদ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বৃক্ষাদিরও মধ্যে এইরূপ গুণভেদে তারতম্য লক্ষিত হয়। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ"—ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত। তাঁহারা অগ্রজন্মা, সত্ত্বপ্রধান, এই জন্যই তাঁহারা অন্যান্য বর্ণের গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেন। অন্য বর্ণ না হইয়া ব্রাহ্মণই কেন গুরু হইলেন, এ কথা বলিতে পার না যখন সামঞ্জস্য সৃষ্টির মধ্যে নাই—তখন কেহ

সুন্দর কেহ অসুন্দর—কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ নিকৃষ্ট, কেহ জ্ঞানী কেহ জ্ঞানহীন হইবেনই। অতএব যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী হইলেন,—তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। আর এ গুণগত বিভাগে আপত্তি করিবার যো নাই। প্রথমে এইরূপ হইয়াছিল, তার পর গুণগুলি স্ব স্ব বংশে সংক্রামিত ও পরিস্ফুট হইতে থাকায় ক্রমে উহা বংশগত হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে অন্যায় এমন কিছু হয় নাই; বরং উৎকর্ষ লাভের পক্ষে এই নিয়মই সমীচীন। অবশ্য ইহাতে যে দোষ ঘটিবে না তাহা নহে, কিন্তু কোন নিয়মটাই তো শেষ পর্যন্ত নির্দোষ হইয়া থাকিতে দেখা যায় না। এক একটি বংশের এক একটি বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বের ধারাটি লোপ পাইতে পারে না যদি ব্যবসায়টি বংশানুগত হয়। লোকস্থিতির পক্ষে আমার মনে হয় ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। তবে ইহা নিশ্চিত, ব্রাহ্মণদের যে সম্মান আছে তাহা ব্রাহ্মণত্বের জন্যই। যেখানে ব্রাহ্মণোচিত গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয় সেখানে তাহাকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া ডাকা হয় মাত্র, ব্রাহ্মণের সম্মান সে লাভ করিতে পারে না; তাহার দ্বারা শূদ্র বা ভৃত্যের কার্য্যই করাইয়া লওয়া হয়। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ

শূদ্রের সমান। তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"শান্তং দান্তং জিতাত্মানং জিতক্রোধং জিতেন্দ্রিয়ং।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

তবে বংশের ধারা বংশধরগণের মধ্যে কিছু না কিছু থাকেই—এই জন্যই ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাকে সম্মান করাও কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহার মধ্যে ভাবী ব্রাহ্মণ বিরাজ করিতেছেন।

রামব্রহ্ম। এ মন্দ কথা নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ তো অন্য বর্ণের গুরু, আবার গুরুগিরি ব্যবসায়ও বংশানুক্রমিক চলিতেছে; সুতরাং উপযুক্ত লোক যদি পাওয়া না যায় তবে যাহাকে তাহাকে গুরু করা চলে কি? তা ছাড়া গুরু ত্যাগ করিলে নির্ব্বংশ হইতে হয় এরূপ ভয় দেখানও হইয়া থাকে।

মধুপণ্ডিত। আজ কাল যেরূপ অপ্রতিহত গতিতে বংশবিস্তার হইতেছে তাহাতে বংশ লোপের আশঙ্কা নাই। তার পর গুরুকরণের বিষয়—যাহাকে তাহাকে তো গুরু করা চলে না, শাস্ত্রে তো সে কথা নাই। উপযুক্ত লোককেই গুরু করিতে হইবে। অবশ্য গুরুর বংশে যদি উপযুক্ত

লোক থাকেন তবে তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিতে হইবে। কিন্তু গুরুবংশে যদি উপযুক্ত লোক না থাকেন তবে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবে না। ইহা স্পষ্টই শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

রামব্রহ্ম। বল কি ভায়া, শাস্ত্রে এ রকম আছে নাকি? তবে তো শাস্ত্র আমাদের খুব উদার।

মধু। নিশ্চয়ই! তোমাকে শাস্ত্রোক্ত গুরুর লক্ষণগুলি শুনাইয়া দিই—

"শান্তং সুশীলং ধর্ম্মজ্ঞং শাস্ত্রজ্ঞঞ্চারুদর্শনং।
দয়ালুং পুত্রিণং দান্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ॥
জ্ঞানপূর্ণং শাঠ্যশূন্যং বয়োজ্যেষ্ঠমবৈরিণম্।
অন্তর্ব্বহিস্তুল্যচেষ্টং সদা সস্মিতভাষিণম্॥
গৃহেঽনাসক্তবৎ সন্তং গৃহস্থং তং গুরুং ভজেৎ॥"

শান্ত, সুশীল, ধর্ম্মবিৎ, শাস্ত্রদর্শী, সুরূপ, দয়ালু, পুত্রবান্, দান্ত এতাদৃশ গুণযুক্ত গৃহীকেই গুরুরূপে আশ্রয় করিবে। যাহার অন্তর ও বহির্দ্দেশ উভয়ত্রই সমব্যবহার, যিনি নিরন্তর সহাস্য মুখে কথা কহেন, যিনি সাধু এবং অনাসক্তভাবে গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন তিনিই গুরুর যোগ্য।

"শিষ্য আত্মা গুরুর্মতঃ" শিষ্য আত্মা সদৃশ অর্থাৎ নিজ আত্মাকে যেমন লোকে ভালবাসে শিষ্যকেও সেইরূপ যিনি ভালবাসেন, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।

গুরুর আরও লক্ষণ আছে বলিতেছি। যিনি গুরু তিনি—"শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্" হইবেন। অর্থাৎ তিনি শুদ্ধাচারী (শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদি যিনি নিয়মিতভাবে করিয়া থাকেন) সুপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ যাহার খ্যাতি আছে, লোকে যাহাকে সজ্জন বলিয়া জানে), শুচি (যিনি কদন্ন ভোজন, কদর্য গ্রহণ বা নীচ লোকের সেবা করেন না), দক্ষ (যিনি অপটু নহেন নিত্যানিত্য বিচারবান্ ধ্যানাদি সাধনে কুশলী) এবং সুবুদ্ধিমান্—অর্থাৎ শিষ্যের ভ্রান্তি দূরীকরণে সমর্থ।

"উদ্ধর্তুঞ্চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।"

যিনি যোগবলে বলীয়ান্, যিনি উপদেশ দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করিতে পারেন, শিষ্যের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিবার সামর্থ্য যাহার আছে, এবং যিনি উপযুক্ত দণ্ড দ্বারা শিষ্যকে কল্যাণপথে রক্ষা করিতে

পারেন, যিনি তপঃপরায়ণ, সত্যবাদী ও গৃহস্থ (সন্ন্যাসী নহেন), তাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠই গুরুপদের যোগ্য।

মন্ত্রমুক্তাবলীতে গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন,—

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ॥
শ্রীমানন্নতমতিঃ পূর্ণোহহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোহর্চ্চাসুকৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহেশক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহঃ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদগরিমাম্বধিঃ॥

অগস্ত্য-সংহিতায় আছে :—

"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ॥"

বিষ্ণুস্মৃতিতে আছে :—

"পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ॥"

শিষ্যের নিকট যিনি পরিচর্য্যা অথবা যশোলাভে ইচ্ছুক নহেন, কৃপালুস্বভাব, সর্ব্বপ্রাণীর উপকারকর্ত্তা, ধনাদিলাভে নিস্পৃহ, সর্ব্বমন্ত্রাদিতে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ, আলস্যবিহীন ব্যক্তিই গুরুপদবাচ্য।

এখন কোন্ ব্যক্তিকে গুরু করা নিষিদ্ধ তাহা শুন। যামলে :—

"অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকং॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জয়েন্মতিমান্ সদা।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জয়েৎ॥"

যে ব্যক্তি অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রবিহীন, কুৎসিতকার্য্যে অনুরক্ত, ধূর্ত্ত, সৎক্রিয়াবিহীন, শঠ, বামন, গুরুনিন্দক, জলরক্তবিকারী (জল এবং রক্তের দোষ যাহার আছে), মাৎসর্য্যশালী লক্ষণাক্রান্ত গুরুকে শিষ্য বর্জ্জন করিবে।

তন্ত্রসারে :—

"বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ॥

অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাশক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥"

যিনি বহু ভোক্তা, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়লোলুপ, কুতর্ক-কারী, দুষ্টাশয়, অবাচ্যবক্তা, পরগুণের নিন্দক, সর্ব্বাঙ্গ রোমবিহীন, অথবা বহুরোমবিশিষ্ট, নিন্দিতাশ্রম-সেবী, এবং যাঁহার দন্ত ও ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার শ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, দুষ্টলক্ষণান্বিত ও বহু সম্পত্তি সত্ত্বেও যিনি পরিগ্রহের জন্য ব্যগ্র, এইরূপ ব্যক্তিকে গুরুকার্য্যে নিযুক্ত করিলে শিষ্য শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

ক্রিয়াসার সমুচ্চয়ে :—

"শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽধিকাঙ্গকঃ॥
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষৈ র্বিমুক্তো য স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥"

যিনি শ্বিত্রীরোগগ্রস্ত, গলিতকুষ্ঠ-রোগী, নেত্রপীড়া-সমন্বিত, অতি খর্ব্বাকৃতি, কুনখী, শ্যাবদন্ত (যাঁহার প্রধান দন্তদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দন্ত থাকে), স্ত্রী-

পরায়ণ, যাঁহার কোন অঙ্গ অধিক বা কম, যিনি মুখে ধর্ম্মের ভাব দেখাইয়া অন্তর্ভাব গোপন রাখেন, যিনি রোগগ্রস্ত, বহুভোজী, বাচাল, এই সকল দোষযুক্ত ব্যক্তিই নিন্দ্যগুরু বলিয়া অভিহিত হয়েন। অতএব উক্ত প্রকার দোষবিহীন ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য।

রামব্রহ্ম। এ সব লক্ষণ মিলাইয়া লইলে গুরু তো পাওয়াই শক্ত। আচ্ছা, অন্য বর্ণের মধ্যে যদি এ সব সদ্‌গুণ থাকে, তবে তাঁহাকে গুরু করা যায় কি না?

মধুপণ্ডিত। ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু। ব্রাহ্মণের অভাবে শুদ্ধ-চেতা, ভগবদেকাগ্রচিত্ত, শান্ত প্রকৃতি, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, সৎক্রিয়ানুরক্ত ক্ষত্রিয়ও গুরু হইতে পারেন। নারদপঞ্চরাত্রে ইহার উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন জাতিকে ক্ষত্রিয়, অভাবে বৈশ্য ও শূদ্রকে বৈশ্য এবং শূদ্রকে শূদ্র দীক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্ববর্ণেরই বিলোমে দীক্ষাকার্য্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যের গুরু হইবে না, বা বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের গুরু হইবে না, অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারিবে না। ইহাই শাস্ত্রবিধি—ইহার

?তিকূল স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলে ঐহিক ও পারত্রিক ম্ম বিনাশ পায়।

রামব্রহ্ম। তা হলে সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র ?ওয়া ঠিক নয়?

মধু। শাস্ত্রের শাসন তো দেখ্‌লে? আরও ?নাই। কুলচূড়ামণি গ্রন্থে আছে,—

"উদাসীনোহ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনাং।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥"

উদাসীনের গুরু উদাসীন হইবেন, বানপ্রস্থের ?ান ?স্থাবলম্বী, যতীদের গুরু যতীন্দ্র ও গৃহস্থদের গুরু গৃহস্থই হইবেন।"

?ল্পে আছে—

"কলত্র-পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ।

রামব্রহ্ম। গুরু কি হঠাৎ যাকে তাকে শিষ্য কর্‌বেন?

মধু। নিশ্চয়ই না। গুরু শিষ্যের লক্ষণ মিলাইয়া ?ইবেন। শিষ্যের লক্ষণ কি শুন।

?ন্ত্রসারে :—

"শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।

পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সোঽপি দানধ্যানপরায়ণঃ॥"

মন্ত্রমুক্তাবলীতে :—

"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রাণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং।
নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৄণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাবিচারবান্॥"

ভাগবতে একাদশস্কন্ধে :—

"অমান্য মৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥
জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষর্থমিবাত্মনঃ॥

নিষিদ্ধশিষ্যের লক্ষণ :—

পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ।
দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ॥

নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ।
গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ॥

আগমসারে :—

"অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়ামৎসরগ্রস্তা সদাপরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽন্যেঽপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ॥"

সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ তবে এস, আর একদিন এসব কথাবার্ত্তা তোমার সঙ্গে হবে।

রামব্রহ্ম। একটি কথা মাত্র আরও জিজ্ঞাসা করতে আজ চাই।

মধু। বল।

রামব্রহ্ম। দীক্ষা যদি কেহ নাই লয় তাতে কিছু কি দোষ আছে?

মধু। যদি হিন্দুয়ানী মানতে চাও, শাস্ত্র মানতে

চাও, তবে দোষ আছে বই কি। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না। বিবাহ যেমন গৃহস্থ-জীবনের অপূর্ব্ব মিলন-ক্ষেত্র; ইহাতে যেমন দুটি বিভিন্ন হৃদয়ক্ষেত্র গিরিনিঃসৃত দুটি নির্ঝর-ধারার মত মিলিত হইয়া ভগবৎপাদপদ্মরূপ সাগরসঙ্গমের দিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে সংমিলিত দেখিবার দীক্ষাই প্রশস্ত পথ। দীক্ষা না হইলে এই শুভ সম্মিলনের অন্য উপায় নাই। গুরুই এই জীব ও শিবের সংযোগ-ক্ষেত্রের সন্ধিস্থল, সুতরাং সদ্‌গুরুর আশ্রয় করিয়া জীবনের অপূর্ব্ব রহস্য ভেদ করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই পরমধর্ম্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥"

দীক্ষিত না হইয়া জপ পূজাদি করিলে পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

শ্রুতি বলিতেছেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম॥"

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন,—

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ ।

দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদযত্র কুত্রাশ্রমে বসন্ ॥

দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্নচ সদ্‌গতিঃ ।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥

অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ।

অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি ॥

উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ ।

ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা ॥

নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ।

ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ ॥"

রামব্রহ্ম। আচ্ছা যে বহু জন্ম ধরে তপস্যা করে এসেছে, হয়ত একটু বাকী আছে, তাকেও কি দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে ?

মধু পণ্ডিত। হবে শুকদেবকেও দীক্ষা লইতে হইয়াছিল, নারদাদিরও দীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। অর্জ্জুন, উদ্ধবের-ও গুরু ছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্রেরও

বশিষ্ঠদেবের নিকট উপদেশ লইতে হইয়াছিল। তবে দু'এক জনের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা জন্মাবধি সিদ্ধ! তাঁহাদের গুরু, তাঁ'দের আত্মা; তাঁ'দের সংখ্যা অতি অল্প। প্রহ্লাদের কোন গুরুকরণ হয় নাই, এবং জড়ভরতেরও আর কাহারও নিকট শিক্ষা লইতে হয় নাই। সুতরাং ইহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে যিনি আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে অনুভব করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়গ্রন্থি আপনা হইতে ভিন্ন হইয়াছে, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার বোধ হয় আর দীক্ষার আবশ্যকতা নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামব্রহ্ম। তোমার সে দিনকার কথা শুনে আমার বিশেষ উৎসাহ হয়েছে। ভায়া তবে দীক্ষাটা এবার লওয়া যাক্—কি বল?

মধু পণ্ডিত। স্বচ্ছন্দে। এতে আর কে আপত্তি করিবে? আমাকে আর জিজ্ঞাসা করা কেন?

রামব্রহ্ম। ভায়া, এত বড় একটা কাজ, তোমার যুক্তি পরামর্শ না লইলে কি চলে?

মধু। তুমি ত নিজের বুদ্ধিতেই সব কর, এ ক্ষেত্রেই বা জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যকতা অনুভব করচ কেন?

রামব্রহ্ম। ওই তো তোমাদের পণ্ডিত হওয়ার দোষ! কিছুতেই সোজা ভাবে কথাটা নিতে পার না।

মধু। আজ্ঞা তা' নয়! কথাটা যদি সোজা হ'ত' তা'হলে সহজ ভাবেই নিতে পারতাম। কিন্তু বিষয়টাই যে একটু জটিল। কাজেই—

রামব্রহ্ম। তোমাদের বাপু সবই উল্টো। কাল তোমার কথা শুনে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়েছে। সুতরাং দীক্ষা গ্রহণ ক'রব, কথা তো এই। এর ভিতর আবার জটিলতা কোথায়?

মধু। তা' তো হলো। দীক্ষা নেবে কার কাছে? দীক্ষা লওয়াও শক্ত, দীক্ষা দেওয়াও শক্ত।

রামব্রহ্ম। এই যে তুমি সে দিন বল্লে, দীক্ষা না লওয়া অন্যায়। দীক্ষাহীন ব্যক্তির সদ্‌গতি লাভ হয় না। আরও কত কি সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালে, তোমার বক্তৃতা শুনেই তো আমার ভয় লেগে গিয়েছে—কি জানি যদি হঠাৎ মরে যাই, শেষ কালে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে

গাছে গাছে বেড়াব, তার চেয়ে দীক্ষাটা নিয়ে রাখা ভাল। আখেরে কাজ দিতে পারে।

মধু। ওঃ ভূত হবার ভয়ে বুঝি তোমার এত উৎসাহ?

রামরঙ্ক। আরে তা' নয়, তা' নয়—ওটা একটা কথার কথা মাত্র! দীক্ষা নিই কার কাছে সেইতো ভাবনা! নিতে হলে মার কাছে নিতে হয় কিন্তু কি জান ভায়া, মা হলেন স্ত্রীলোক। মা যদিও পরমগুরু, তথাপি স্ত্রীলোককে গুরু করতে আমার ইচ্ছা হয় না। খুড়া মহাশয় পণ্ডিত বটেন, কিন্তু বুদ্ধিটি কিছু প্যাচোয়া গোচের, তাঁর উপর শ্রদ্ধা আমার তাদৃশ নাই; সুতরাং মন্ত্র নিই কার কাছে? তুমি দীক্ষা দেওয়া যে শক্ত বলচ তার মানে কি বুঝলাম না? দীক্ষা টিক্ষা তো আমার কনিষ্ঠ পিতৃব্যপুত্রও অনেককে দিয়ে থাকে। নিরক্ষর রামধন ভট্টাচার্য্যেরও আটকায় না তবে যায় তার কাছে নেওয়া, এইটাই শক্ত মনে হচ্চে।

মধু। তাঁ'রা কা'কে কি দেন, তা ঠিক জানি না, তবে এ কথা বেশ ভাল করেই জানি প্রকৃত দীক্ষা তাহাদের কাছ থেকে কাহারও হয় না তোমরা

রামরঞ্জ! সে কি বল ভায়া, আমরা দীক্ষা দিতে পারি না,—এ আবার কেমন কথা! আমার খুড়ো হচ্চেন জয়রাম বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, আমার পিতা ছিলেন, একজন দিগ্‌গজ বল্লেই হয়। আমার পিতামহর নাম এদেশে কে না জানে? আমরা আজ চোদ্দ পুরুষ থেকে ঐ কর্ম্ম করে আসচি, আর তুমি বল্লে কিনা, আমরা দীক্ষা দিতেই জানি না। আমিই না হয় পণ্ডিতের ঘরে মুর্খ জন্মেছি, তবু বাপ পিতামহের ধাঁচা গুলো তো একটু আধটু জানা আছে। কিছু কিছু বুঝি বই কি।

মধু। তা বুঝবেন না কেন? পূর্ব্ব পুরুষের ধাঁচা কিছু কিছু কেন—সবই জানা আছে, একথা তো আমি অস্বীকার করচি না। তোমার পিতামহ বা পিতা যেমন দীক্ষা দিতেন এবং তোমার খুল্লতাত যেরূপ দীক্ষা দিয়ে থাকেন, সে দীক্ষা দিতে তো তুমিও পার। কিন্তু আমি যে দীক্ষার কথা বলচি, সে দীক্ষা অন্য দীক্ষা হে—সে শিষ্যও আজব ধরণের—সে গুরুও আজব রকমের।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

যাহাকে বহু লোক শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং শ্রবণ করিলেও যাহাকে বহু লোক জানিতে পারে না, তাহার বক্তা আশ্চর্য্য, যে লাভ করে সেও আশ্চর্য্য এবং নিপুণ আচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট তাহার জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য।

বুঝেছ ভায়া আমি নিন্দার কথা কিছু বলি নাই। এ দীক্ষা দেওয়া বড় শক্ত—পণ্ডিত হলেই যে তা পারবেন, তা মনে করা ভুল। এদেশের পণ্ডিত সে দেশের বিদ্যার খবর কি জানিবে?

রামব্রহ্ম। কি ভায়া, তুমি কোন্ দেশের দীক্ষার কথা বলচ? আমাদের দেশের দীক্ষা-প্রণালীর কথা তুমি বলচ না—তবে? শ্রীবিষ্ণু, তাই সোজা করে বল।

মধু। দাঁড়ান, ঝাঁ করে আমার কথাটা বুঝে ফেলেছেন ভেবে নিশ্চিন্ত হবেন না, আপনি যা মনে করচেন, ঠিক আমি তা মনে করিনি।

রামব্রহ্ম। সে কি কথা হলো! আরে তুমি বু- ঝা বলতে চাচ্ছ, আজ কাল কত কি ছাই ভস্ম হয়েছে—ওই তার নামটা হচ্ছে কি—থিয়সফি। বলি এরই কথা বলছিলে তো? হাঁ হাঁ, শুনেছি তাদের দলে অনেক দেশী লোকও আছে, সাহেব মেমও ঢের আছে! তারা ভূত প্রেত মানে, ইহলোক পরলোক মানে। আর পাঁচ-সাত জন বসে প্রেতগুলোকে কাছে ডেকে এনে অনেক কথা বার্ত্তা কয়। আবার ঘরে দুয়োর দিয়ে নাক টেপাটিপিও করে। হবিষ্যও চলে, আবার মৎস্য মাংসেরও শ্রাদ্ধ হয়! অনেক বুজরুক ঐ দলে ঢুকে বেশ বুজরুকীও দেখায় শুনেছি!

মধু। হরেকৃষ্ণ! আমি থিয়সফির কথা আপ- নাকে কেন বলতে গেলাম! আপনি ইংরাজি বিদ্যায় সুপণ্ডিত, ওসব বিষয় আপনিই ভাল জানেন আমরা টুলো পণ্ডিত, ওসব থিওসফি-টিওজফির ধার ধারিনে। আমি বল্‌ছিলাম প্রকৃত দীক্ষার কথা, যাহা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয় প্রথা। কোন সাহেবি-গন্ধ তাহার মধ্যে নাই। তাহা আমাদের সনাতন আর্য্য- প্রথা। অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

রামবক্ষ। এই দেখ দেখি! আমি এখনই একটা মস্ত ভুল করে বসেছিলাম আর কি! যাই হ'ক যা বললে একটু স্পষ্ট করে বল। আমি তোমার হেঁয়ালির মধ্যে প্রবেশ করা একটু শক্ত মনে করচি।

মধু। এতে হেঁয়ালি ত কিছু নেই। প্রাণটা ভারতবর্ষীয় হলেই আমার কথাটা ধারণা করা কঠিন হবে না। তবে কি জান, পথটি সুগম নয়।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া,
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

আমরা সামান্য ব্যাপারী, অগম্য সিন্ধুর মাঝে পণ্য নিয়ে তরি বাহা, বড়ই শক্ত ব্যাপার, তার উপর নিজেদের মতলবের ঠিক নাই; যে ব্যাপার আরম্ভ করেছি, তার উপর আস্থা সকল সময় হয় না, সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিপরীতগামী স্রোতের মধ্যে পড়ে নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্চি! এ পথে প্রকাশও যেমন, অপ্রকাশও তেমনই ভরসা শ্রীগুরুর অভয় পাদপদ্ম। গুরুকেও তেমন প্রাণ ভরে বিশ্বাস কর্‌তে পারি কৈ—এই সংশয়-দোলায় দোল খেতে খেতেই আমাদের জীবন শেষ হয়ে আসে। কোথায়

আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি বিন্দুমাত্র, আর কোথায় তিনি অনন্ত প্রেমসিন্ধু! তবুও বিশ্বাসের ভেলায় চড়ে, ভাসতে ভাসতে যে কেহ সেই অগম্য দেশের দিকে পাড়ি দেয়—শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রসাদে ভবসিন্ধুর পরপারে গিয়ে সে উত্তীর্ণ হয়ই। তখন "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা"। তখন সে প্রিয়তম প্রাণসখাকে পাইয়া অনন্ত আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

"কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং।"

সর্ব্ব কামনার পরিসমাপ্তি, জগতের কতবিধ আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত ফল, বিশাল ও বিস্তীর্ণ কীর্ত্তি এবং নিজের স্থিতি,—এ সমস্তকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, শুধু সেই অলক্ষ্যদেশকে লক্ষ্য করিয়া! বুকে কত সাহস থাকা প্রয়োজন বল দেখি! ধন জনের মমতা, সংসারের গূঢ় সৌন্দর্য্য এ সমস্তই পিছনে ফেলিয়া, গহন কণ্টকাকীর্ণ পথ বাহিয়া চলিতে হইবে—শুধু সেই অলক্ষ্য দেশকে লক্ষ্য করিয়া। "অলক্ষ্য সে দেশ যদি লক্ষ্যে আসে, পথের দূরত্ব

তখনি প্রকাশে"—এ সেই দেশ, এ আটলান্টিক মহা সাগরের ও পারের দেশ নয়—এ একেবারে "অলক্ষ্য দেশ। সাধু গুরুকৃপাতে কোন কোন সাধকের সেই দেশ পানে লক্ষ্য হয়, সে তখন সেই পথের যাত্রী হইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। গুরু বলেন "শ্রদ্ধার সম্বল আছে তো? আর নয়নে অশ্রু, আর প্রাণে ব্যাকুলতা আছে তো? ইহাতেই আপাততঃ পথের কড়ির যোগাড় হইবে। সুদীর্ঘ পন্থা বহু ভার স্কন্ধে—রে পথিক! তবু ভয় করিস্ না এখনি তাঁর বাঁশরী শুনিতে পাইবি। বাঁশরীর মধুর সঙ্গীত যে দিক্ দিয়া বাজিবে, সেই দিক্ ধরিয়া চলিয়া যাইও, আর 'কোথা পন্থা'' বলিয়া কাঁদিতে হইবে না। "ডর্ নাহি কুছো, ডহরা না পুছো, বাঁশরী শুনত কবরী বাঢ় যাঈ"—

ওরে 'পুছিতে হবে না পথ ডর নাহি কিছু,
বাঁশরী ডাকিছে দূরে ধাও তারি পিছু পিছু।'
এ পথের এই মন্ত্র। একটা পাগলের গানশুন।
সে জন আমার কি যে আমার তা' জানি না।
প্রাণ কেমন করে তাহার তরে
থাকতে নারি কোথাও ঘরে

এ জগৎ ছাড়া হৃদয়ভরা কে বুঝ্‌বে মনোবেদনা।
বুকের ভিতর দুরু দুরু,
প্রাণ সদাই করে উড়ু উড়ু,
আর এমন করে ক'দিন চলে এ যে চিরদিনের যাতনা॥
সে আমার বন্ধু আমার মিতা,
সে আমার পিতা আমার মাতা,
সে আমার ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী, সঙ্গ মোর সে ছাড়েনা।
সে কোথায় থাকে কোন্ সুদূরে,
কভু মোর এই অন্তঃপুরে ;
আমি তারে চিনলাম না রে, সে চিন্তেও মোরে দিল না॥
সে নিকটে কি দূর-দূরান্তরে
বুঝতে তা যে পারলাম্ না রে,
সে হাওয়ায় আসে হাওয়ায় মেশে ধরতে তারে পাবি না।
(সে আমার) অশন যোগায়, বসন যোগায়,
কাঁদলে এসে অশ্রু মুছায়,
প্রাণ কি করে ভাবলে তারে, ভাবলে পরেও আসে না।
কোন্ পথেতে পাব তারে
মন আমার তাই ভাবে রে,
সে নিরাকার কি সাকার বটে, তত্ত্ব কিছু পেলাম না।

ছুটে যেতে ইচ্ছা করে,
কোন্ পথেতে ছুটব ওরে,
প্রাণ কি করে তাহার তরে
দিবানিশি পুড়ছে যেরে
সে কোন পথেই নেইক বসে আবার সকল পথেই দেয় হানা।
শুধু প্রাণে উঠে ব্যাকুলতা
ছুটে বেড়াই পাই না কোথা
সে কোথায় আছে কোথায় বা নেই কিছুই তার তো যায় নি জানা।
(কভু) মোর এই প্রাণের মাঝে
ব্যথার মত জাগে সে যে
কি করে প্রাণকে বুঝাই কোথায় বা পাই বুঝতে কিছুই পারি না।
ধরা যদি দেয় সে নিজে
তবেই তার ধরা সাজে,
নয়ত শুধু সেজে গুজে কোন ফলই হয় না।

রামব্রহ্ম। ভায়া, যত সহজে তুমি কথাগুলো বলে গেলে, শুনতে শুনতে আমারও তাই ধারণা হচ্ছিল, শুনতেও বেশ লাগলো, তবু কি জান এর ভেতরের

.: একটা কথা সেটা যেন কোথায় গুলিয়ে গেল! ঠিক ধরতে পারচি না। তাতেই ভাবছি, কথাগুলি যতটা সহজ মনে হচ্ছিল, বুঝি ততটা নয়।

মধু পণ্ডিত। আবার গোল ঠেকলো কোন্ খানে?

রামব্রহ্ম। ঐ যে তুমি বার পাঁচ-সাত 'অলক্ষ্য অলক্ষ্য' করলে, আর একবার কটমট করে কি হিন্দি আওড়ালে --কথাগুলি কিন্তু বেশ মিষ্টি। আর তোমার ওই শেষের গানটা—এই সবগুলি শুনে ধাঁধা লেগে গেল! কি যেন বুঝলাম—আবার বেশ বুঝতেও পারলাম না। আমার মনের ভাবটা ঠিক প্রকাশ করতে পারচি না। অর্থাৎ কি যেন জিজ্ঞাসা ভিতরে থেকে গেল, অথচ তা যে কি, ঠিক প্রকাশ করতে পারচি না। আচ্ছা ভায়া, এসব তত্ত্ব বড় কঠিন, নয়? এ কালে এ সব হবার নয়। কি বল?

মধু পণ্ডিত। আরে রাম! রাম! সকলের হবার নয় কেন? যা সকলের নয়, তাযে কারও নয়। যে কেউ চেষ্টা করবে, যে কেহ এ তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইবে, সেই এ পথের আলোক দেখতে পাবে। এতো আর কারও ইজারা করা মহল নয়। তবে সে কালের ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বস্ব খুইয়ে এই পথের

পথিক হয়েছিলেন, তাই তাঁদের বংশধরগণের এপথে প্রবেশলাভ করবার অপেক্ষাকৃত একটু সুযোগ আছে মাত্র।

রামব্রহ্ম। আচ্ছা ভায়া, আমি যে দীক্ষা নেব, দীক্ষা ব্যাপারটা যে কি, একবার আমাকে বুঝিয়ে দাও না।

মধু পণ্ডিত। আমিও তো ভাই, সেই কথাই বলছিলাম। দীক্ষা নিতে চাচ্চ—বেশ কথা, দীক্ষা নাও। কিন্তু ও ব্যাপারটা যে কি তা বেশ করে জেনে শুনে তারপর দীক্ষা লওয়াই তো ভাল।

রামব্রহ্ম। বিলক্ষণ, আমিও তাই চাই। কোথায় যেতে হবে, না জেনে ধাঁধা ক'রে উঠে, বেগে গমন করলেই কি আর গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারা-যায়? এত সহজ কথাটাও কি আর আমি বুঝি না।

মধু পণ্ডিত। আমি সেই কথাই তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছিলাম। এখন অবশ্য বুঝতে পারবে যে, আমার কথাগুলো হেঁয়ালি নয়।

রামব্রহ্ম। তাইত ভায়া, তোমার কথাগুলি ভাল করে এতক্ষণ বুঝতে পারি নাই। যাই হ'ক, দীক্ষা ব্যাপারটা আমাকে বেশ করে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধু পণ্ডিত। দীক্ষা মানে উপদেশ, অথবা নিয়ম বা সঙ্কল্প করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়াই দীক্ষা। "দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং হীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা...।"—যাহাতে পাপক্ষয় হয় এবং আত্যন্তিক জ্ঞানের উদয় হয় তারই নাম দীক্ষা। আগে বুঝ পাপ বস্তুটা কি? তার পর দেখ পাপক্ষয় করার কি প্রয়োজন? অন্তর-গ্লানিই তো পাপ; কারণ সে আনন্দকে আচ্ছাদন করে রাখে; সত্যকে আবৃত করে রেখে মিথ্যার বিভীষিকা দেখায়। এই জন্যই পাপ অন্ধকারস্বরূপ; এ ঠিক জ্ঞানের বা আলোকের বিপরীত। তাই অজ্ঞানের মত পাপ আর নাই। সেই অজ্ঞান গেলেই জ্ঞানের প্রকাশ হলো। যদ্দ্বারা এই অজ্ঞান ধ্বংস হয়, জ্ঞান পরিস্ফুট হয়, তারই নাম আসল দীক্ষা। সেই জন্য গুরু-স্তোত্রে বলা হলো—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা যোগে মানবের মোহনাশ করিয়া জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন সেই গুরুকে নমস্কার করি।

এই যে উপনয়ন-সংস্কার আমাদের দেখছ, ইহাই আমাদের প্রথম দীক্ষা। এই সময়ে আমরা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করি। তার পর চিরজীবন এই গায়ত্রীই আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করেন। এই গায়ত্রী-মন্ত্রটি ভাল করে বুঝতে হবে। তা হলেই সমস্ত দীক্ষার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হবে। গায়ত্রীর স্তোত্রে আছে—"গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।"—যে তোমাকে গায়, তাহাকে তুমি ত্রাণ কর, সেইজন্য সকলে তোমাকে গায়ত্রী বলিয়া জানে।

এখন দেখ, গায়ত্রী আমাদের ত্রাণ করেন কোথা হইতে? এই শরীরবন্ধন হইতে ত্রাণ করেন। সুতরাং এই দেহটা ও তাহার গুণাগুণগুলিও বেশ ভাল করে বুঝতে হবে। "তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥" এই ক্ষেত্র (শরীর) "যৎ" অর্থাৎ ইহার স্বরূপ যে প্রকার (জড়দৃশ্যাদি-স্বভাবযুক্ত); "যাদৃক্" যাদৃশ ইচ্ছাদি-ধর্ম্মযুক্ত; "যদ্বিকারি" যেরূপ ইন্দ্রিয়-বিকারযুক্ত; "যতশ্চ" যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন; এবং "যৎ" যে প্রকার স্থাবর-জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন; এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ

যৎস্বরূপ, এবং "যৎপ্রভাবঃ" অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগ হেতু যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন ; তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ উত্তমরূপে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। সেই অধ্যায়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে অজানা কিছু থাকিবে না।
গীতায় আছে—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

যে শরীর যথার্থ ব্রহ্মবীর্য্যে উৎপন্ন, তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা তপস্যার দিকে থাকিবেই। শম-দম-শৌচাদি-সাধনে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মিবেই। এ স্বভাব তাঁর লোক-দেখানো স্বভাব নহে ; তিনি যে শরীর পাইয়াছেন তাহারই এ সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া। যদি কোন প্রকারে এই সংস্কার তাঁহার আচ্ছাদিত থাকে, তাহা হইলেও বিশেষ কোন ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি আপনাকে কোন দিন না কোন দিন পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিবেই। যদি না করে, তবে বুঝিতে

হইবে, তাঁহার জন্মের কোন গোল আছে। ক্ষান্তি, সরলতা, আস্তিক্য, জ্ঞানানুরাগ—এ সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। এই সকল লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণকে এখনও চিনিতে পারা যায়। অধুনা কাল-প্রভাবে, জল বায়ুর প্রভাবে ব্রাহ্মণের বর্ণ, স্বর, গঠন, আকৃতি সমস্তই হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল অন্তর্নিহিত গুণাবলি দ্বারা এখনও ব্রাহ্মণকে চিনিয়া লওয়া কিছু মাত্র কঠিন নহে।

উক্ত প্রকার বৃত্তিগুলি যাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহারাই যথার্থ ব্রহ্ম গায়ত্রী-মন্ত্রের অধিকারী। এই গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেই ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মণ" হইলেন। তখন বেদজ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার চিত্তাকাশকে আলোকিত করিয়া রাখিবে। সুতরাং আত্মার একত্ব ও অবিনশ্বরত্ব ভাব তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার দীনতা, অসত্য ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ দিয়া থাকে। এই খানেই ব্রাহ্মণের নিকট গায়ত্রীর "গায়ত্রী" নাম সার্থক হয়।

গায়ত্রী উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইতেছে আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার বিশ্বব্যাপকত্ব ভাবটির

উপলব্ধি করা। এখন চেতনাটি কেবল মাত্র যে স্থূল শরীরকে অধিকার করিয়া আছে, তাহা যে শুধু স্থূল নহে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; এবং "বোধ" বা "জ্ঞান" এই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর কারণ দেহেরও অতীত, ইহা লক্ষ্য করাইয়া দেওয়াই গায়ত্রীর কার্য্য। চেতনা স্থূল শরীরে আবদ্ধ বলিয়া এবং আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি বহির্মুখ হওয়ায়, আপাততঃ দেহাতিরিক্ত "অহং"কে ভাবা যায় না। এখন "অহং"কে মনে করিতে গেলেই দেহটাকে মনে পড়ে, দেহকে বাদ দিয়া কিছুতেই "অহং"কে ভাবা যায় না। কিন্তু নিদ্রার সময় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন স্থূল শরীরটা বর্ত্তমান থাকিলেও, চেতনা সূক্ষ্ম-শরীর ব্যাপিয়া থাকে। স্থূল-শরীরকে তখন লঘু আঘাত করিলে বা শরীরের উপর কোন ভার চাপাইয়া দিলেও সে কিছু মনে করে না, কেননা তখন চেতনা স্থূলাভিমানিনী নহে। কিন্তু সে সময় "অহং" থাকে না এ কথা বলিবার উপায় নাই, কারণ তখনও স্বপ্নঘটিত সমস্ত ব্যাপারের একজন দ্রষ্টা বর্ত্তমান। এই "অহং" বা "দ্রষ্টা" সূক্ষ্মশরীরাভিমানী। সুষুপ্তি অবস্থায়ও কারণ-শরীরকে ব্যাপিয়া যে চৈতন্য থাকে তাহাই

কারণ-শরীরের "অহং"। সুষুপ্তির পর তুরীয়াবস্থায় যখন এই কারণ-শরীরেও "অহং" জ্ঞান থাকে না, তখনকার "অহং" আর কোন শরীরসম্বন্ধী বা বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। তখন তাহা নিরুপাধিক বিশ্বব্যাপী। এই "অহং"ই তখন বাসুদেব। একটি মাত্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যেও বিশ্বদাহিকা শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ এই সোপাধিক স্থূলাভিমানী "অহং"ই নিরুপাধিক ও বিশ্বময় হইয়া "বাসুদেব" হইয়া যান। এই যে "অহং"-এর প্রসার, ইহাই "অহং"এর প্রকৃত স্বরূপ, এবং ইহাই গায়ত্রী-উপসনার লক্ষ্য; সুতরাং গায়ত্রী-উপাসনা কি জানিতে হইলে ওঁকারের উপসনা করিতে হয়! ওঁকারের সাধনাই হইল প্রকৃত গায়ত্রীর সাধনা। ওঁ = অ + উ + ম + ঁ (নাদবিন্দু) + অব্যক্ত (নাদবিন্দুর অতীত অবস্থা)। যে চৈতন্য এই শরীরত্রয়ে এবং তাহার অতীত ভাবে বর্ত্তমান, তাহাই ওঁ। সেই জন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"প্রণবস্তস্য বাচকঃ"। এখন বুঝিতেছ এই সাধনায় যিনি পাকা, পরিত্রাণলাভ তাঁহার পক্ষে আর কিছু মাত্র কঠিন নহে।

আমরা যে ভাবে গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

প্রত্যহ জপ করি, তাহা ঠিক গায়ত্রীর উপাসনা নহে। তাহা অত্যন্তই স্থূল অনুষ্ঠান মাত্র। তথাপি এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যহ গায়ত্রীর অর্থ ভাবনা করিয়া জপ করিতে থাকেন, তিনি ক্রমশঃ নিজের অন্তঃকরণে এইটি অনুভব করিতে পারিবেন যে, সেই একই বিরাট্ চৈতন্য "ভূর্ভুবঃ স্ব"কে ব্যাপিয়া আছেন। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তাঁহার অস্তিত্বেই এই ত্রিলোকের অস্তিত্ব, তাঁহার প্রকাশেই এই জগতের প্রকাশ; তাঁহার আনন্দই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জড় চেতনের মধ্যে হাসিয়া উঠিতেছে। তখন সে বুঝিতে পারে ত্রিলোকের আত্মাই তাহার আত্মা। সুতরাং লোকের চিত্ত বহির্মুখ হইলেও, ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন হইলেও সে বুঝিতে পারে যে, ত্রিলোকের সঙ্গে এবং ত্রিলোকস্থ জীবের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নিত্য ও সত্য। তাহা বুঝিতে পারিলেই জানা যায় যে এ আত্মা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।" যতক্ষণ আত্মার এই অমৃতত্বে বিশ্বাস না হয় ততক্ষণ বুঝিতে হইবে গায়ত্রী-সাধনা সংপূর্ণ হয় নাই। এই জন্যই দীক্ষার প্রয়োজন. "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এইটি জানাই শেষ। ইহাই আসল

বেদান্ত। যে বিদ্যা দ্বারা এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহারই নাম ব্রহ্মবিদ্যা। ঋষিরা এই বিদ্যারই খুব আদর করিতেন। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—অক্ষর পুরুষকে যদ্দ্বারা জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। এই বিদ্যাকে শিষ্য যখন জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, তখনই তাঁহার প্রকৃত দীক্ষা হয়। এই দীক্ষা দ্বারাই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, সসীমের সহিত অসীমের যোগসাধন হয়।

যে জিনিষটা যে জিনিষের অনুরূপ নয়, বা যারা একধর্ম্মযুক্ত নয়, তাদের পরস্পর সদ্ভাব হয় না, তাদের মন মেলে না। জলেই জল মিশে, কিন্তু পাথরের সহিত কি জল মিশ খায়? ধূলার সঙ্গে ধূলা মিশিয়া যায়। এইরূপ যাহারা একধর্ম্মযুক্ত তাহারা পরস্পরে মিলিত হয়, বিরুদ্ধধর্ম্মীরা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না আপাততঃ একধর্ম্মযুক্ত না হইলেও তাহাদের মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ যে সকল বিরুদ্ধধর্ম্ম আছে, তাহার পরিহার না করিলে কোন দিনই তাদের মিল হয় না। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মাও যদি একধর্ম্মযুক্ত না হইতেন,

তবে কোন দিনই তাঁহারা পরস্পরে মিলিতে পারিতেন না, এবং তাঁহারা পরস্পরের কখন "সখা" হইতে পারিতেন না। তবে জীবের সঙ্গে জীবের, বা জীবের সঙ্গে পরমাত্মার যে আপাত ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা কতকগুলি বাহ্য আবরণ বা সংস্কারের ভেদমাত্র। সে আবরণ সরাইয়া দিলেই আর কোন ভেদ থাকিতে পারে না। জীবের সঙ্গে জীবের বা জীবের সঙ্গে পরমাত্মার যে আপাত বিরুদ্ধ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা জীবের স্বরূপগত ভিন্নতা নহে, তাহা কেবল একটা বাহ্যসংস্কারের আবরণমাত্র। সাধনসাহায্যে উহা অপসারিত করা যায়, এবং তাহা অপসারিত হইবামাত্রই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়, এবং তাহার স্বরূপসত্তায় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাবটি পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন নদী যেমন সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে, তদ্রূপ সংস্কারাচ্ছন্ন জীব সংস্কারমুক্ত নির্ম্মল হইয়া সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। জীবনের এমন সুন্দর পরিসমাপ্তি আর নাই। এমন মিলন-মাধুর্য্য আর কোথাও বুঝি তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না। এই মিলনের সৌন্দর্য্যকে আরও মহিমান্বিত

করিবার জন্যই প্রকৃতি দেবীর অনন্তরূপরাশি যেন আরও দিগ্‌দিগন্তে ভরিয়া উঠে। শারদ জ্যোৎস্নায় তারকামণিমণ্ডিত নীলাকাশ যেন আরও হাসিয়া উঠে। মলয়ানিল ধীর মন্দ ভাবে হিল্লোলিত হইতে থাকে। স্তরে স্তরে শিশিরস্নাত সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুম-সমূহের সৌরভধারা দিগ্‌দিগন্তে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। মৃদু কম্পনে বৃক্ষশাখা, লতা-পাতা, ফল-ফুল সকলেই যেন আপনাদের হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস ঘোষণা করিতে থাকে। বিহগকুল হর্ষে গাহিয়া উঠে। হরিণ সচকিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে কাহার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে থাকে। সবই যেন আনন্দরসপূর্ণ। সবই যেন ভাবে ডগমগ। প্রকৃতির এই সুমধুর মিলনক্ষেত্রে রসরাজ রসিকশেখর স্বকীয় চরণাশ্রিতা ভক্তিবিহ্বলা সখীগণের সহিত মধুর রাস-রসে নিমগ্ন হন। এ অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত যৌবন, অফুরন্ত মাধুর্য্য এবং অফুরন্ত মিলন! "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।" এস ভাই আমরা এ রাসের অধিকারী না হইলেও, সেই ভক্তিমতী, কৃষ্ণৈকসর্ব্বস্বা গোপাঙ্গনাদের পাদপদ্মে প্রণত হই। তাঁহাদের মিলনসম্ভোগে যে একটি অনাবিল অপার্থিব

নন্দরসের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, এস, সেই ধারায় একবার এই হৃদয়কে ডুবাইয়া লই। ভক্তের সহিত ভক্তের জীবননাথের যে মিলন, সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভক্তজীবনের অপূর্ব্ব সার্থকতা, অকৈতব ফলসন্ধানহীন প্রেম দেখিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করি এস! সে যে এক অভিনব, নিত্য নূতন রস! সে রসের সহিত পৃথিবীর আর কোন রসের তুলনাই হয় না।

রামব্রহ্ম। ভায়া র'স, আগাগোড়া কথাগুলা একবার বুঝে নিই। আবার যে সবই গোল ঠেক্‌চে। এতক্ষণ বেশ বুঝছিলাম। হঠাৎ তোমার উচ্ছ্বাসে আমার সমস্ত বোঝা বুঝি ভাসিয়া যায়।

মধু পণ্ডিত। ভাই, যদি ভাসিয়াই যাও এবং আপনাকে সামলাইতেই না পার, তবুও আর ভাবিও না। আমি স্পষ্টই দেখচি তোমার চখে জল আসচে। তোমার হৃদয়ে যে ভাবের উৎস ফুটিয়া উঠিতেছে, আর তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিও না। এই যে প্রেমের জোয়ার আসিতেছে, জানিও, এই শুভক্ষণেই জীবন-তরি ভাসাইতে হইবে।

রামব্রহ্ম। না ভায়া, তুমি ভুল করচ। আমার

এ কঠিন হৃদয়ে ভক্তির উৎস ফুটিবার সম্ভাবনা নাই। আমার এখনও অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। সে সব কথা পরে হবে, আজ তবে গৃহে যাই।

———

গুরুবিচার

সাধনার স্তর

রামব্রহ্ম। ভায়া, দীক্ষা সম্বন্ধে সে দিন আরও কি বলবে বলেছিলে, আজ বল না? কথাগুলো বেশ মিষ্টি লাগচে। আমার মনের অনেক সন্দ মিটে যাচ্চে।

মধু পণ্ডিত। আজ তোমাকে একটি গুরুতর বিষয় বলবো। সেটি গুরু-সম্বন্ধে। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের কি সম্বন্ধ, এবং গুরুর প্রয়োজনীয়তাই বা কি, গুরু কত প্রকার, গুরুর কাজ কি, এ সমস্ত কথাই আজ বলব মনে করেচি। কথাগুলি খুব গুহ্য, অবহিত হয়ে শুনে যাও।

রামব্রহ্ম। গুরুর আবার প্রকারভেদ আছে নাকি ভায়া? মন্ত্র তা হলে বার বার বদলাতে হয় নাকি?

মধু। আহা, সেই সব কথাই বল্‌চি। ব্যস্ত হও না। এসম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য, সবই তোমাকে

শুনাব এখন, তুমি ধৈর্য্য ধরে শুনতে পারলেই হল।

রামব্রহ্ম। হ্যাঁ, এসব কথায় ঘুম আসবার কথাই বটে। কিন্তু যাই হক, এ পর্য্যন্ত তো আমি এক রকম শুনে যাচ্চি। এখন শেষ পর্য্যন্ত ঘুম না এলে বাঁচি। মধ্যে মধ্যে তুমি এমন দু একটা কথা বল যে, সে সম্বন্ধে একটু ভাবলেই কোন সিদ্ধান্ত করতে পারি না বটে, কিন্তু ঘুমটা এসে পড়ে দেখেছি। যাই হক, সে কথাগুলো একটু বাঁচিয়ে বল্লেই আমি বেশ শুনে যেতে পারব।

মধু পণ্ডিত। প্রথম কথা এই, যাঁকে গুরু করবে, তাঁকে মানুষ মনে করলে চলবে না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। *

রামব্রহ্ম। সে কি ভায়া! গুরু যে জলজীয়ন্ত মানুষ, তাঁকে মানুষ না ভেবে আর কি ভাবতে পারি, তুমিই বল?

* গুরৌ মনুষ্য তাবুদ্ধিঃ শিষ্যাণাং যদি জায়তে।
ন হি তস্য ভবেৎ সিদ্ধিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥
তস্মাদ্দেবেশি নিয়তং শ্রীগুরুং শিবরূপিণম্।
সংচিন্তয়েদতঃ প্রাজ্ঞস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

মধু। ওহে গুরুর হাড়-মাস-আওলা শরীরটা তো আর গুরু নয়। শরীর তো পঞ্চভৌতিক, সে তোমারও যেমন সকলেরই তেমন, হয়েচে আবার ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং গুরু বলতে এ শরীরটাকে বুঝলে চলবে না। গুরু হলেন অশরীরী পুরুষ।

রামব্রহ্ম। বাঃ, আমার শরীরটা বাদ দিলে আমিও তো অশরীরী পুরুষ, তবে আমিই বা আমার গুরু নই কেন?

মধু। তোমার একটু বুঝবার ভুল হচ্চে। 'তুমি' বলতে তোমার শরীরটা তুমি মনে করচ কিনা, এই খানেই মস্ত গলদ থেকে যাচ্চে। 'তুমি' শরীর নও আত্মা,—এই কথা যদি মনে করতে পার, তবে তুমিই তো তোমার গুরু। শাস্ত্র তো বলেইছেন "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ।" এক আত্মাই গুরু। শাস্ত্র তাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

'ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং, ন গুরোরধিকং তপঃ।
ন গুরোরধিকো মন্ত্রঃ ন গুরোরধিকং ফলম্॥
ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ।
ন গুরোরধিকা মুক্তি র্ন গুরোরধিকো জপঃ॥"

গুরু মানে কি জান? গুরু মানেশুদ্ধ একটা মানুষ

নয়। গুরু মানে প্রকাশ, জ্ঞান, জ্যোতি। তাই অবিদ্যার অন্ধকার ভেদ করে যিনি সত্যের আলোক দেখাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুশব্দবাচ্য। শাস্ত্রে কি বলেছেন জান ?

"গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥"

"গু" শব্দের অর্থ অন্ধকার, এবং "রু" শব্দের অর্থ তেজ। স্বকীয় তেজ বা জ্ঞান দ্বারা তিমির ধ্বংস করেন বলিয়া ব্রহ্মই গুরুস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই।

"গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্মমায়াভ্রান্তি-বিমোচকঃ॥"

গুরুর প্রথম বর্ণ 'গু" দ্বারা মায়াদি গুণ এবং "রু" এই বর্ণ দ্বারা মায়াভ্রান্তিবিমোচনকারী ব্রহ্মকে বুঝায়। অর্থাৎ "গুরু" এই শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভাব প্রতিপাদিত হইল।

এখন দেখ অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না নিশ্চয়ই, সুতরাং যদি কেহ অন্ধকারে চলিতে চায়, তবে তাহার পদে পদে স্খলন হইবেই, এ কথা মানতো ? কিন্তু কেহ যদি তার হাতে একটা দীপ দেয়, তবে সে

দীপের সাহায্যে পথও দেখিতে পায় এবং তাহার গমনও বিঘ্নশূন্য হয়। ঠিক সেই রকম এই জগতে আসিয়া এবং এই পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া মানুষ আপনার গন্তব্য স্থান কোথায় ঠিক করিতে পারে না। এই জগৎকাণ্ডটা এক রকম ধাঁধার মত, সবই এখানে অন্ধকার, সবই এখানে অস্পষ্ট। এই যা দ্বারা সেই ধাঁধা কাটিয়া যায়, অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, আর সব স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাই হল আলোক বা জ্ঞান। এই শরীরটাও দেখ একরকম ধাঁধা। এটা কিছুই নয়, একবার চোখ বুজলেই এর লম্ফ-ঝম্প শেষ, অথচ যতদিন জীবিত আছি, এই শরীরটাকে একটা জড় অনাত্মপদার্থ বলে মনে করতেই পারি না। যতবার নিজেকে ভাবি, এই শরীরটাকেই মনে পড়ে, শরীরের অতিরিক্ত আত্মাকে কিছুতেই আলাদা করে ভাবা যায় না। অথচ এটা যে কত মিথ্যা, তা মৃত্যুর দিনেই সবিশেষ বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তবুও এই অসত্যটাকে ছেড়ে থাকবার জো নেই। বুঝতে পারচ কি অজ্ঞানতাই জড়িয়ে আছে। ইহাই তোমার "গু" শব্দের লক্ষ্যার্থ। আর "রু" কি জান? যখন আলোক প্রকাশিত হয়, অজ্ঞানতা ছুটিয়া যায়,

আত্মার জ্যোতির্ময় স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখন এই দেহটাকে কোন প্রকারে আর "আমি" বলতে ইচ্ছা করে না। দেহটাকে স্পষ্টই আত্মা থেকে একটা স্বতন্ত্র বস্তু বলেই ধারণা হয়। তখন দেহের সুখ-দুঃখে আর "আপনাকে" সুখী বা দুঃখী বলে মনেই হয় না। ঠিক কেমন জান? হীরা মনে করে যদি তুমি একটা পাথরকে আপনার প্যাঁটরায় পুরে রাখ, তার পর যদি প্রমাণ হয়ে যায় ওটা সামান্য একটা নুটীং মাত্র, তখন যেমন তা ফেলে দিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না, তদ্রূপ এই শরীরটাকে যখন "অনাত্ম" পদার্থ বলে সত্য সত্যই ধারণা হয়, তখন এর জন্য এখনকার মত টান থাকে না। রাজা দিলীপ বলেছিলেন "পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু।" "অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ"— এই যে বোধ, ইহাই আত্ম বোধ এবং ইহাই "রু" শব্দের লক্ষ্যার্থ, এই ভাবটাই "গুরু ভাব"। সেই জন্য যাঁর শরীর আছে অথচ তাহাতে আত্মবোধ নাই বা আসক্তি নাই অর্থাৎ আত্মার যেখানে স্বতঃ প্রকাশ, তিনি শরীরধারী হইলেও, সেই জ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষও গুরু-

দবাচ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। সুতরাং শরীর থাকিলেও জ্ঞানবান্ আত্মারই স্বরূপ। এই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অপার-করুণানিধান আত্মজ্ঞ গুরুর মহিমা দেখিয়া শাস্ত্র আনন্দে ঘোষণা করিলেন।—

"গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥"

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা এবং গুরুই একমাত্র গতি। শিব রুষ্ট হইলে গুরু উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে রক্ষা করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই।

"শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং
মুক্তাফলৈর্ভূষিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্
মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপানিধানম্॥
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং॥
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥"

শ্বেতবস্ত্রধারী, শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত, মুক্তাফলে অলঙ্কৃত,

দিব্যমূর্ত্তিধারী, যাঁহার বামদিকে দিব্যশক্তি সমাসীন, যাঁহার মুখ মন্দ মন্দ হাস্যে শোভিত, যিনি পরিপূর্ণ কৃপালু, আনন্দময় ও আনন্দদাতা এবং যিনি সদা প্রসন্ন, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, নিজবোধযুক্ত, যোগীন্দ্রদিগের পূজিত এবং যিনি সংসারের একমাত্র বৈদ্যস্বরূপ, সেই গুরুদেবকে সর্ব্বদা ভজনা করি।

যাহার ঐকান্তিক গুরুভক্তি আছে তাহারই নিকট পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সেই ভবসংসারের পরপারে উত্তীর্ণ হয়। শিব বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ॥"

যে ব্যক্তির দেবতার প্রতি, এবং দেবতার ন্যায় গুরুর প্রতি পরা ভক্তি আছে, মহাত্মারা বলিয়া দিলে, তাহারই নিকটে এই সকল বিষয় (পরমার্থ তত্ত্ব) প্রকাশিত হয়।

এই গুরুদেবই পরমকৃপাযুক্ত হইয়া শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়া দেন, "আমার স্বরূপ" আমার কাছে প্রকাশ করিয়া দেন। কর্ণে যাহা শুনিয়াছিলাম, যাঁহাকে চক্ষে কখনও দেখি নাই—সেই "কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং" পরম ধ্রুবকে অন্ত

তিনি দেখাইয়া দিয়া বলেন—এই বস্তুই সেই, তুমি যাহা দেখিলে, "সর্ব্বজীবে তদাকারে বস্তু বিহরিছে"—সকল জীবেরই মধ্যে তোমার "এই আত্মাই" প্রকাশিত রহিয়াছেন। তখন ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে করযোড়ে শিষ্য গুরুদেবকে এই মন্ত্রে প্রণাম করেন—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

মনে রেখ, এ হলেন মহান্ত-গুরু, আর যাঁকে দেখালেন "তিনিই প্রকাশ হ'ন চৈত্যগুরুরূপে।"

তারপর যখন শিষ্যের মধ্যে আরও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের নির্ম্মল কৌমুদী ফুটিয়া উঠে, তখন সে সেই জ্ঞানালোকে দেখিতে পায় যে, সেই একই আত্মা সর্ব্বভূতের মধ্যে ব্যবস্থিত। তবে আর পর কে, সবই তো আপনার, সবই যে আত্মা, সবই যে গুরু। তখন নির্ধূতকল্মষ শিষ্য বিশ্বময় এক চিদ্‌গুরুকে দেখিতে পাইয়া এই বলিয়া প্রণাম করেন—

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তখন যাঁহার প্রসাদে তিনি এই দেহপাশ হইতে

মুক্তিলাভ করিয়া ভবভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, এবং পরমানন্দের অধিকারী হইয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক ভক্তি-গদগদকণ্ঠে গাহিয়া উঠেন—

"সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

জীব সংসাররূপ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নরক-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে,—এই ঘোর নরক হইতে যিনি জীবগণকে পরিত্রাণ করেন সেই গুরুচরণে নমস্কার করি। যিনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত

সংসার ব্যাপ্ত করিয়া অধিষ্ঠিত আছেন, এবং যিনি সেই পরব্রহ্মপদ দর্শন করাইয়া দিয়াছেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। চিন্ময় পরমব্রহ্ম এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; সেই ব্রহ্মপদ যিনি দেখাইয়াছেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। জীব বহুজন্মের কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; যিনি আত্মজ্ঞান-প্রদানে সেই কর্ম্মপাশ হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, এবং গুরুই শিবস্বরূপ; গুরুই পরমব্রহ্ম; অতএব সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। গুরুই বিশ্বের আদি, কিন্তু নিজে তিনি অনাদি, শ্রীগুরুই সর্ব্বদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরু হইতে প্রধান আর কেহই নাই, অতএব সেই গুরুকে প্রণাম করি।

তার পর যখন সাধকের স্ব-স্বরূপে অবস্থান হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব-মোহ ঘুচিয়া যায়, সমস্ত ভূর্ভুবঃস্বঃকে আপনা হইতে আর পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না, সমস্তই যখন এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই প্রকাশ বলিয়া

অনুভূত হয়, যখন জড় আর চেতন বলিয়া কোন ভেদ থাকে না, জন্ম-মৃত্যু বলিয়া কোন ধাঁধা থাকে না, স্ত্রী পুরুষ বলিয়া কোন লিঙ্গভেদ থাকে না, উচ্চ-নীচের কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না, তখন আত্মারূপ গুরুর তুরীয় মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। শিষ্য তখন ব্রহ্মানন্দে বিভোর; দ্বন্দ্ব, মোহ-মায়া ও ভ্রান্তির অতীত হইয়া আপনাতে আপনি শুদ্ধ। ইহাই নির্ব্বিকল্প অবস্থা। এই অবস্থা যখন ছাড়িয়া যায় ও বুদ্ধিতে আবার পঞ্চতত্ত্বের ছায়া পড়ে, "অহং মমেতি" বুদ্ধি অস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়, তখনও সেই চরম জ্ঞান তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় না। যেমন মৃগনাভি কোন পাত্রে রাখিয়া তার পর উঠাইয়া লইলেও সেই পাত্রে তাহার গন্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়, তদ্রূপ যে সাধক সমাধিস্থ হইয়া আত্মার নির্ব্বিকল্পত্ব, অখণ্ডত্ব ও "শান্তং শিবমদ্বৈতং" —এই ভাবকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিলেও সেই ব্রহ্মানন্দকে বিস্মৃত হন না; তাহা তাঁহার মনোমধ্যে লাগিয়া থাকে। তখন তিনি সেই অবস্থাকে স্মরণ করিয়া তুরীয় গুরুকে প্রণাম করেন—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদং কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥
নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥"

রামব্রহ্ম। ভায়া আজ অপূর্ব্বতত্ত্ব তোমার কাছে শুনলাম। এখন একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। গুরুর জাতিবিচার কিরূপে এ ক্ষেত্রে চলিবে? যিনি আত্মবান্ ও আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁর ভেদবুদ্ধি নাই, সুতরাং জাতিও নাই। তখন আমি কেন গুরুর জাতি লইয়া বিচার করিতে যাই?

মধুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিধি মান্য করিতে হইবে। বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।" সুতরাং গুরু ব্রাহ্মণ

হওয়াই উচিত। ব্রাহ্মণেরাই এক প্রকার "গুরুর জাতি" বলিলে হয়। তবে পূর্ব্বকথিত গুণাবলী গুরুতে আছে কি না পরীক্ষা করিয়া লইবে। এ পরীক্ষা কঠিন নয়, দুই এক মাস একত্র থাকিলেই গুরুর গুণাগুণ বুঝিতে পারিবে। যাঁহাদের এতটুক ধৈর্য্য বা অবসর নাই, তাঁহাদের যাহা ভাগ্যে থাক্ হউক। এই যে গুরু ইনি মন্ত্রদাতা গুরু, প্রথম গুরু। কিন্তু যিনি দ্বিতীয় গুরু, অর্থাৎ সদ্‌গুরু বা মহান্ত গুরু হইবেন, তিনি ব্রাহ্মণ নাও হইতে পারেন। সদ্‌গুরুর কোন জাতি বা লিঙ্গ প্রকৃত পক্ষে থাকিতে পারে না। সে গুরু আজব দেশের লোক কি না, সেখানে ভেদাভেদের কোন কথা নাই। সে দেশ, দেশাচার ও লোকাচারের অতীত। সেখানে বিধি-নিষেধ বর্জ্জিত। সে কি রকম জান?

"গুপ্ত আনন্দধামের মেলা
সে যে নিত্যং দেবদুর্ল্লভং তোরা দেখবি কে আয় -
এই বেলা।"

এই সদ্‌গুরুর শূদ্র-শরীরও হইতে পারে, ম্লেচ্ছ-শরীরও হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিও, তিনি ঋষি-

পদবীতে আরূঢ়, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি মহান্তগুরু, তিনি আপ্ত, তিনি অন্য কোন জাতি নহেন। কিন্তু সমস্ত সদ্গুরুই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নহেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ ভেদভাবের অতীত নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা মহাপুরুষ; কেন না তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু "বহূনাং জন্মনামন্তে" যে জ্ঞানী পুরুষ বিশ্বকে বাসুদেব বোধ করেন, সে অবস্থার লোক খুবই দুর্লভ। ইঁহারাই আসল মহান্তগুরু। ইঁহারা জগতে জগদ্গুরু বলিয়াও পূজিত। সনক, সনন্দ, সনাতন, বশিষ্ঠ, ব্যাস, নারদ, কপিল, শুকদেব-প্রভৃতি এই শ্রেণীর গুরু। শাস্ত্র ইঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

গুরুতত্ত্ব কতকটা বুঝলে তো? এইবার শিষ্য-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি, শুন। প্রথমে বুঝ শিষ্য কাহাকে বলে। 'শাসিত হইব' এই যাঁহার ইচ্ছা তিনিই প্রকৃত শিষ্য। সুতরাং মাথা উঁচু করে, হামবড়া হয়ে শিষ্য হওয়া যায় না। শিষ্য হতে হলে নিরভিমান হতে হয়। নিজের বলতে যা কিছু সমস্ত তাঁকে অর্পণ করিতে হয়।

"দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।
আত্মদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ॥"

শিষ্য গুরুর নিকট লজ্জা বর্জ্জন করিয়া দীর্ঘদণ্ডাকারে প্রণাম করিবে এবং আত্মা, স্ত্রী ও পুত্র প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে নিবেদন করিবে।

"শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ।
গুরুভ্যঃ শিষ্যতো যোগং শিষ্য ইত্যভিধীয়তে॥"

যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুকে শরীর, অর্থ, প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক গুরু শিষ্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ হন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য বলিয়া কথিত।

"বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরশ্ছেদোঽপি বা ভবেৎ।
তথাপি ন পরিত্যাজ্যং গুরুবাক্যং কদাচন॥"

যদি প্রাণবিয়োগ হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, যদি মস্তকচ্ছেদন হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

সেইজন্য শিষ্য হতে হলে দেখতে হবে তাঁর মনে প্রকৃত প্রপন্নাবস্থা এসেছে কি না। জন্ম জরা মৃত্যু দেখিয়া তাঁর যথার্থ ত্রাস আসিয়াছে কি না। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ তাঁহার চলিয়া গিয়াছে কি না। যথার্থই পারে যাইবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা

জন্মিয়াছে কি না। এ যদি না হইয়া থাকে, তবে সহস্র উপদেশেও কিছু হইবে না, স্বয়ং ব্যাসের মত সদ্‌গুরু আসিলেও কিছু হইবে না। যদি প্রকৃত পিপাসা জন্মিয়া থাকে, যদি প্রকৃত ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে, তবে গুরুরও কৃপা হয়, এবং তাহাতে শিষ্যেরও কল্যাণ হয়। দরবিগলিতনেত্রে শিষ্য গুরুকে বলিতেন—"আমি দীন, আমাকে আশ্রয় দাও; আমি ভীত, আমাকে অভয় দাও; আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে রক্ষা কর।" শিষ্য মনের এইরূপ ভাব লইয়া গুরুর নিকট আসিলে গুরুর মধ্যে শিষ্য-ত্রাণকারিণী চিৎ-শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে, গুরুও অবশ হইয়া শিষ্যের মঙ্গল করিতে উদ্যত হন। ঠিক যেমন বৎসকে দেখিয়া গাভীর স্তন ক্ষরিত হইতে থাকে, সৎ-শিষ্যকে দেখিয়া গুরুর হৃদয়কন্দর হইতে তেমনি করুণার উৎস ফুটিয়া বাহির হয়। শরীরটা তো যন্ত্র, কিন্তু গুরু আসলে আত্মা। জল যেমন পাথরের গা দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি গুরুকৃপা গুরুর শরীর-মন হইতে নির্মল ঝরণার জলের মত ফুটিয়া বাহির হইয়া সংসারতপ্ত শিষ্যের প্রাণকে সুশীতল করিয়া দেয়। যদি কেহ দেখিতে জানে

তবে সে দেখিতে পায় গুরুর শরীর হইতে একটি বিদ্যুতের ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল আলোকরশ্মি শিষ্যের সমস্ত গাত্রে আসিয়া পড়িতেছে। এই আলোক-রশ্মিই গুরুশক্তি, ইহার দ্বারাই শিষ্যের অজ্ঞানতিমিরের উপশম হয়। শিষ্যের মধ্যে শরণাগত হওয়া ভাবটিই তাহার কল্যাণলাভের কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্জ্জুন যখন আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া দিলেন, তখনই তাঁহার করুণালাভে সমর্থ হইলেন। অর্জুন বলিয়াছিলেন—"আমি প্রপন্ন, আমি শরণাগত, আমাকে জ্ঞান দাও।" "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" তারপর অর্জ্জুনের যখন মোহ অপগত হইল, আত্মসাক্ষাৎকার হইল, হৃদয় ভক্তি-প্রেমে ভরিয়া উঠিল, তখন বিশ্বরূপ দর্শন করিবার স্বতঃ ইচ্ছা হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। কিন্তু তখন তিনি আপনাকে তাহার অযোগ্যই মনে করিয়াছিলেন। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টু-মিতি প্রভো। যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মান-মব্যয়ং।" তখন অর্জ্জুনের হৃদয়সখা ভবনদীর কাণ্ডারী জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ভয় কি, তোমার সাধ্য না থাকে, আমার সাধ্য তো আছে,

আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি"......"পশ্য মে-যোগমৈশ্বরম্।" শিষ্যের প্রতি গুরুর এতই দয়া! এ গুরুকে কি কেহ মানুষ বলিতে পারে?

শঙ্করাচার্য্য শিষ্যের লক্ষণ করিয়াছেন—"শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব।" যে গুরুভক্ত সেই প্রকৃত শিষ্য। যে শিষ্যের ভক্তির সম্বল নাই, সে গুরু-কৃপা আকর্ষণ করিতে পারে না। গুরুকৃপা যদি না হয়, তবে শিষ্য হওয়া না-হওয়া দুই সমান।

রামব্রহ্ম। ভায়া এ কথাটা তোমার কেমন কেমন ঠেক্‌ছে। ভাল বুঝতে তো পারলাম না। তুমি বলচ গুরুকৃপা যদি না হয়, তবে শিষ্য হওয়া না-হওয়া সমান। তা হলে তো শিষ্যের পক্ষে বড় মুস্কিল দেখ্‌চি। গুরু যদি খামখেয়ালি হন, তবে শিষ্যকে তো পথে দাঁড়াতে হবে। তার সমস্ত শ্রম পণ্ড হবে?

মধু পণ্ডিত। এই দেখ, সেই ভুল আবার করছ। স্মরণ রেখ, গুরু তোমার আমার মত মানুষ নন। যারা দেহসম্বন্ধী, তাদেরই রাগ অভিমান হয়, তাঁরা তো দেহসম্বন্ধী ন'ন, সুতরাং তাঁদের সেপ্রকার অভিমান বা ক্রোধ হবার সম্ভাবনা কোথায়?

পাতঞ্জল দর্শনের একটি সূত্র তোমাকে শুনাই। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যাদি ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, জাতি আয়ু, ভোগ, এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে নাই, এরূপ পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে? যাঁহারা "মহান্ত গুরু" তাঁহারা কতকটা ঐরূপ পুরুষবিশেষ। সুতরাং ইতর সাধারণ সংসারাসক্ত পুরুষের মত শিষ্যের সহিত তাঁহাদের কোন স্বার্থসিদ্ধির সম্বন্ধ নাই। অগাধ করুণা-প্রযুক্তই শিষ্যের ভববন্ধন মোচনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাঁহারা শিষ্যের মঙ্গল করিবার জন্য চেষ্টিত হন। সুতরাং যেখানে তাঁহারা দেখেন যে, যত্নশীল অপ্রমাদী শিষ্য নিরন্তর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট, সেখানে তাঁহারাই তাহার সমস্ত বাধাকে দূর করিয়া তাহার গন্তব্য পথকে সুগম করিয়া দেন। আজকালকার ব্যবসায়ীদের মত তাঁহারা নিজ শিষ্য এবং পর শিষ্য বলিয়া ভেদ করেন না? জিজ্ঞাসু, মুমুক্ষু, সাধনসম্পন্ন, অনলস, পরহিতকারী, বৈরাগ্যবান্ পুরুষমাত্রেই তাঁহাদের শিষ্য। তাঁহারা সকলকেই কৃপা করিতে প্রস্তুত। এমন কৃপাবান্‌দেরও যাহারা কৃপা

আকর্ষণ করিতে না পারে, তাহাদিগকে দুর্ভাগাই বলিতে হইবে বৈ কি। তাহার মানে এই, যাহারা ভড়ং দেখাইতে চাহে, কিন্তু সাধনা করে না, পরন্তু বৃথা কার্য্যে সময়ক্ষেপ করে, তাহাদের চিত্ত হইতে সংসারবাসনা তখনও চলিয়া যায় নাই, এবং ভগবানকে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় বস্তু বলিয়াও ধারণা করিতে পারে নাই; সুতরাং এরূপ সংশয়াত্মা শিষ্য কিরূপে গুরুকৃপা লাভে সমর্থ হইবে?

রামব্রহ্ম। ভায়া, অতি চমৎকার কথাই শুনালে। গুরুর এত মহিমা তা আগে মনেই করতে পারি নি। আমরা আমাদের নিজেদের আদর্শ মতই গুরুকে মনে করতাম কি না, কাজে কাজেই গুরুর এমন অপার্থিব মহীয়ান্ ভাবকে বুঝতেই পারিনি। মনে করতাম গুরু একদিন শিষ্যকে মন্ত্র দিয়ে গেলেন, তারপর যে সম্বন্ধটা রইল সেটা দেনা-পাওনার।

মধু। আরে ছি! ছি! এই রকম করেই তো আমাদের সনাতন ধর্ম্ম নাশ পেতে বসেছে। গুরু শিষ্যের কি এই সম্বন্ধ! গুরু পিতামাতার চেয়েও বড়। যে গুরুকে দেখে বা স্মরণ করে শিষ্য

অভয় না পায়, জেনো সে গুরুতে গুরুত্ব কিছু নেই। শিষ্যের কাছ থেকে গুরুর লওয়া দূরে থাক, এমন দাতা আর কে আছে? তাই কবির বলেছেন—' গুরুসম কোই দাতা নেহি, যাচক শিখ্ সমান।"

রামব্রহ্ম। কিন্তু ভায়া আজকাল কি আর এ রকম গুরু পাওয়া যায়?

মধু। অবশ্যই দুর্লভ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? "চন্দনং ন বনে বনে, মৌক্তিকং ন গজে গজে।"

রামব্রহ্ম। তবেই তো! এইখানেই যে মস্ত গোল থেকে গেল। আমি ইচ্ছা করলেই তো আর গুরু পাচ্চি না। সুতরাং আমার কাছে প্রকৃত দীক্ষালাভ একপ্রকার আকাশকুসুমের মত বৈ কি?

মধু। না গো না, তুমি যা ভাবচ তা নয়। আচ্ছা, ভগবানকে তোমার সর্ব্বান্তর্য্যামী বলে মনে হয় তো? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এও স্বীকার কর?

রামব্রহ্ম। বিলক্ষণ! তা করি বৈ কি?

মধু। তা যদি হয়, তবে ভাবনা কেন? মনে কর, তোমার মধ্যে যদি গুরুর জন্য তেমন ব্যাকুলতা

থাকে, তা তিনি অবশ্যই জান্‌তে পারচেন, আর তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন সে ব্যবস্থাটাও তিনি অবিশ্যি করতে পারবেন। তবে কথাটা কি জান, একটু তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে।

রামব্রহ্ম। ভায়া, ঐটিই তো আসে না। সব পারি, কিন্তু তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি না। মনটা কেমন উড়ু উড়ু করে।

মধু। এর মানেই হলো কি জান? ভগবান্‌কে আমরা অন্তঃকরণের সঙ্গে তেমন বিশ্বাসই করি না, সুতরাং তাঁকে চাইব কি প্রকারে? টাকাগুলোকে যে প্রকারে আঁকড়ে ধরি, ঠিক সে রকমটি ভগবানের প্রতি হয় না, তাই দুঃখও ঘোচে না।

রামব্রহ্ম। তা তো বটে ভায়া, কিন্তু উপায় কি? মনের যা অবস্থা তা তো তোমাকে সবই বলেছি, আর তুমিও তা বেশ বুঝতে পারচ। এখন এই অবস্থার উপায় কি বলতে পার? অর্থাৎ ষোল আনা ঈশ্বরে মন নাই, সংসারেই মনটা সাড়ে পনের আনা; আর এই এক আনা কি আধ আনা ধর, সেই দিকে। এ অবস্থায় গুরু-টুরু মিলবে বলতে পার? তাঁদের দেখে যদি ষোল আনা বিশ্বাস হয়।

মধু। আরে রাম রাম! তা মনেও করে না। মহাপুরুষদের অদ্ভুত গোচের স্বভাব, তা দেখলে ভক্তি হওয়া দূরে থাক্, অনেক সময় ঠক্ বলে ভ্রম হবে।

রামব্রহ্ম। ঠিক বলেছ ভায়া, তা বড় মিথ্যে নয়। সাধুদের ভাবভঙ্গি দেখে তো অনেক সময় উল্টো ধারণাই হয়। মনে হয় এই বুঝি ব্যাটারা চুরি করতে এসেছে। আচ্ছা এরকম কেন হয় বলতে পার?

মধু। মনটা মলিন বলে। একটা কথা বলি তবে, শুন। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম রামচন্দ্রকে দেখেও রাবণ, কুম্ভকর্ণ বা অন্য কোন রাক্ষসের তেমন তো পরিবর্ত্তন হলো না। কিন্তু সাধুস্বভাব বিভীষণের রামচন্দ্রকে দেখে চরিত্র আরও বিশুদ্ধতর হয়ে উঠলো। তার পুত্র তরণীসেনেরও রামচন্দ্রকে দেখে প্রাণ কেঁদে উঠলো। কে যেন তার হৃদয়ে বলে দিল "এই সেই আরাধনার বস্তু।" বিভীষণ ও তরণীর মন আগাগোড়া নির্ম্মল ছিল বলেই ভগবানের সাক্ষাতে আরও তা বেড়ে উঠলো, ঠিক সে প্রাণের বস্তুকে চিনে ফেললো। কিন্তু অন্য রাক্ষসদের মন সে রকম নির্ম্মল ছিল না, কাজেকাজেই তারা দেখেও

দেখ্‌তে পেলে না। সেটা কি রকম জান? বহুমূল্য মণি পড়ে রয়েছে, তুমি চেন না, কাজেকাজেই তা নজর করলে না; তার চাক্‌চিক্য দেখলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় সেটা যে কত মূল্যবান্ তা বুঝতেই পারলে না। সুতরাং সেটাকে গ্রহণ করবার স্পৃহাও তেমন বলবতী হল না। কিন্তু যে জহুরী, যে ঠিক চেনে, সে দেখেই "এই যে" বলেই মণিটি কুড়িয়ে নেয়। ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দেখলেও মলিন মনের জন্য তাঁকে ঠিক্ ধরা যায় না। সবই তো মনের খেলা। মন যাকে গ্রহণ করে, তাকেই তো পাওয়া যায় কিনা, শুধু বস্তু সম্মুখে থাকলে কি হবে? এই দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অর্জ্জুন-যুধিষ্ঠিরদের যেমন প্রাণটা করতো, দুর্য্যোধনের তেমন কিছু হতো কি? মন নির্ম্মল ছিল বলেই অর্জ্জুনের পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে স্বজনবধে অনিচ্ছা জন্মেছিল, কিন্তু পাপচিত্ত দুর্য্যোধনের কোন বিকারই হয় নাই। আরও দেখ না, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গেলেন, তখন তাঁকে দেখে বসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য রসের সঞ্চার হয়েছিল, মুনি-ঋষিরা তাঁকে আপনাদের "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং" বলে

বুঝতে পেরেছিলেন, উদ্ধবাদি ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া আপনাদের জীবনবল্লভ হৃদয়সখা বলিয়া বুঝতে পেরেছিলেন, ভক্তিমতী মথুরাবাসিনী কামিনীগণ তাঁহাকে আপনাদের প্রিয়জন মনে করে আনন্দিতা হচ্ছিলেন। আর কংস দেখে ভাবলেন, যেন করালকাল সাক্ষাৎ মূর্ত্তি গ্রহণ করে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ যার মন যে প্রকার, পরমাত্মার ছায়া তার মনের মধ্যে ঠিক্ সেই রকম এসে পড়ে। তিনিই তো সব। শত্রু বল, মিত্র বল, আত্মীয় বল, প্রিয়জন বল, সবই তো সেই একেরই মহিমা।

রামব্রহ্ম। তাতো ঠিক্। মন তো আমাদের মলিনই বটে, কিন্তু এই মলিন মনকে শুধরে নিবার কোন উপায় আছে কি? তা থাকে ত বল।

মধু। তা আছে, কিন্তু ওরকম ঢিমে তেতালায় চললে তো চলবে না, আরাম খুঁজতে গেলেও হবে না। ঠিক্ মত খাটতে হবে। পারবে?

রামব্রহ্ম। বিলক্ষণ, আমি তোমার সব কথাতেই রাজি।

মধু। ঐটিই দুর্লক্ষণ; এর মানে কিছুই করবে না।

রামব্রহ্ম। না ভায়া, আমি তোমাকে সত্য বলচি, আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর।

মধু। আচ্ছা, তবে শুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তেমন গুরু না-ই পাওয়া যায়, তবু তো একটা উপায় করতে হবে! সেটা এই—প্রথম, যেখানে সৎ-চর্চ্চা হবে, সেখানে গিয়ে সে সব শোনা। দ্বিতীয় কথা—সদ্‌গ্রন্থ পড়া। তৃতীয় কথা—শাস্ত্রে যা পড়বে বা শুনবে, সেগুলা তোমার মনের সঙ্গে যদি না মিল খায়, তবুও সে গুলাকে জহন্নমে ফেলে দিবার জন্য নেচে উঠো না। অনেক জিনিষ আছে যা সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু বুঝিয়ে দিলে বুঝা যায়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে, যা বুঝিয়ে দিলেও বুঝা যায় না। তাহা সময় সাপেক্ষ—সাধন করিতে করিতে দীর্ঘকাল সাধনাভ্যাসের ফলে আপনার মধ্যে আপনি তাহার অনুভব হইতে থাকিবে। সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন করে শ্রদ্ধাবুদ্ধিটিকে একটু বাড়িয়ে তুলতে হবে। তারপর একটু-একটু লোকের উপকার করতে

চেষ্টা করা, স্বার্থপরতাটা যাতে কমে, যাতে জঘন্ত ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিগুলা একটু নিয়মিত হয়,—এইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারপর কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা, কুকার্য্য,—এসব দিকে মন গেলেও, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা; একটু আধটু সময় নির্জনে আত্মবিষয় চিন্তা করা। যাহাতে থাওয়া-দাওয়া গুলো একটু কম রাজসিক হয় এবং মধ্যে মধ্যে সাত্ত্বিক হয়,—দিবা-নিদ্রা ও বাজে গল্পে সময়ক্ষেপ না হয়,—এই বিষয়গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই গুলিই হইল অধ্যাত্মমার্গের সূচনা বা মুখবন্ধ। তারপর এক দিন শুভদিন দেখে, কৌলিক প্রথামত মন্ত্র নিয়ে ফেল।

রামব্রহ্ম। কি বল তবে কুলপ্রথা-অনুসারে মন্ত্র নিলেই চলবে?

মধু। চলবে না তো কি? কুলগুরুদের কাছে মন্ত্র নিতে হবে না কি?

রামব্রহ্ম। আমি ভাবছিলাম, তুমি বর্ত্তমান গুরুগিরি ব্যবসার উপর যে চটা, পাছে তাঁদের কাছে মন্ত্র নিতে নিষেধ কর।

মধু। বাঃ আমি কালাপাহাড় নাকি, যে দেবতা দেখব আর ভেঙ্গে ফেলব? তা নয়, তা নয়। কুলপরম্পরায় যা চলে আসচে, তা করতে হবে বৈকি? তবে তার পরেও আছে, সে বিষয় সে দিন বলেছি, এবং পরে আরও বলব। তবে আমি বর্ত্তমানকালের ভুঁইফোড়, সবজান্তা, সিদ্ধপুরুষগুলিকে একটু আশঙ্কার চক্ষে দেখে থাকি। কারণ দেশের, দশের এবং ধর্ম্মের নাশ ও আদ্য-শ্রাদ্ধ এঁরাই করবেন। আর দুর্ব্বলচিত্ত, অশিক্ষিত, ধর্ম্মবিশ্বাসহীন, লোভী গুরুদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহাদেরও কাছে দীক্ষা লইতে নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখনও গুরুবংশে দুই চারিটি ভাললোক না পাওয়া যায় তাহা নহে। নিষ্ঠাবান্, বিদ্বান্ ও সাধুপ্রকৃতির লোক দেখিয়াই গুরু করিতে হয়। নেহাৎ না পাওয়া যায়, আপনাদের কুলমন্ত্র মাতা বা অন্য কোন গুরুতর ব্যক্তির নিকট লইলেও হয়।

রামব্রহ্ম। আচ্ছা কুলগুরু বা কোন গুরু-জনের নিকট হইতে মন্ত্র লইলে তোমার পূর্ব্ব-কথিত গুরুতত্ত্বের সহিত খাপ খাবে কি প্রকারে?

মধু। সেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

রামব্রহ্ম। বুঝিয়ে দেওয়াটা তোমার একটা মস্ত গুণ দেখছি। যা বলি তাই তো বুঝিয়ে দাও, কিন্তু বুঝে কে ?

মধু। আচ্ছা চেষ্টাই কর না, তোমার মাথা তো আর বজ্র নয় যে, কোন কথাই তা ভেদ করতে পারবে না ?

রামব্রহ্ম। তা বোধ হয় নয়। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, এ সন্দেহটাও মিটে যাক।

মধু। কথা হচ্চে কি, গুরু যাঁকেই কর, তাতে ক্ষতি নাই, যদি গুরুতে ভক্তি থাকে। পূর্ব্বেই বলেছি, এই শরীরটা তো গুরু নয়। সুতরাং যে কোন শরীর আশ্রয় করেই গুরুকেন্দ্র প্রকটিত হউক না কেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাই সকল গুরুকেন্দ্রের মধ্যবিন্দু হইয়া বিরাজ করেন। গুরু যেমন হ'ক, গুরুর মধ্যে যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের কল্যাণ বিধান করেনই। যেমন প্রতিমাতে দেবতাকে কল্পনা করিতে হয়, সেইরূপ ভগবানের করুণাময়ত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব ভাব গুরুর মধ্যে দেখিতে হয়। অন্তর্য্যামী গুরুরূপে তিনি সব গুরুহৃদয়েই বিরাজ করছেন তো ? সুতরাং

যেমন-যেমন অধিকার, তেমনি-তেমনি গুরুকেন্দ্রের প্রকাশ হতে থাকবে। আসলে তিনিই সকলের গুরু। এইজন্য দেখ, ভিন্ন-ভিন্ন লোকের গুরু ভিন্ন-ভিন্ন হইলেও, গুরুর ধ্যান, মূর্ত্তি ও মূলমন্ত্র সকলেরই এক। আসল কথা এই, তোমার যত-টুকু যোগ্যতা ঠিক্ তদনুরূপ গুরুকেন্দ্রের প্রকাশ হবে তো? তুমি পড়ছ বলেই যে একবারে প্রথম ভাগ না পড়ে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারবে তা মনে করো না। তা সেই পুঁথিগুলো যদি তোমার কেউ ঘাড়ে চাপিয়েও দেয়, তাতে তোমার জ্ঞান প্রথমভাগের চেয়ে একবিন্দুও বাড়বে না, ঘাড়টাই পুস্তকের ভারে বেঁকে পড়বে মাত্র। যেমন একই ছেলের বয়োভেদে তার শরীর ও মন ভিন্নরূপ ধারণ করে, ঠিক্ সেই রকম একই গুরু শিষ্যের অধিকারানুরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। কিন্তু শিষ্যের অবস্থাভেদে তাঁর প্রকাশের ভিন্নতা থাকিলেও স্বরূপতঃ সকল গুরুতেই সেই একই অন্তর্য্যামী গুরু। মা যেমন ছেলের বয়োভেদে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু মা সেই একই থাকেন, তদ্রূপ শিষ্যের যোগ্যতানুযায়ী

বিভিন্ন গুরুকেন্দ্রের প্রকাশ হয়, কিন্তু গুরু সেই একই থাকেন।

রামব্রহ্ম। তা হলে তো শিষ্যের যেমন-যেমন যোগ্যতা বাড়বে, তেমনি-তেমনি গুরু বদল করতে হবে? এমন অদল-বদল কবার করতে হবে?

মধু। বেশী নয়, তিনবার। এই প্রথম গুরু, যাঁর কাছে তুমি গায়ত্রী-মন্ত্রের দীক্ষা পেলে। তুমি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী এইটুকু যিনি জানিয়ে দিলেন। জগতের সঙ্গে তোমার এবং তোমার সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তা যিনি প্রকাশ করে তোমার অজ্ঞানান্ধকার অপনয়ন করলেন, ইনিই হলেন প্রথম গুরু। আমাদের দেশের প্রথমতঃ মন্ত্রদাতা গুরুরাও এই প্রথম শ্রেণীর গুরুর অন্তর্গত। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-দীক্ষাই প্রশস্ত এবং যথেষ্ট। তবে কুলপ্রথানুযায়ী মন্ত্র গ্রহণ করাও ভাল। উপনয়নের সময় দীক্ষা কার্য্যটা ঠিক্ ভাবে হয় না বলিয়াই তান্ত্রিক দীক্ষার আজকাল প্রয়োজন হইয়াছে। ইনি আমার প্রকৃতি বিচার করে, আমার শরীর ও মনের অনুকূল বীজ, মূর্ত্তি, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ও পূজা শিখিয়ে দেন। ইহাতে শরীর-মন নির্ম্মল ও পবিত্র

হয় এবং প্রকৃত দীক্ষালাভের উপযুক্ত হয়। তার পর শরীর যখন শুদ্ধ হয়, মন যখন নির্ম্মল হয়, সত্ত্ব গুণ বাড়িতে থাকে, ভগবদ্‌লাভের ব্যাকুলতা সমস্ত মন-প্রাণকে তদভিমুখী করিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে, আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞানের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া উঠে, তখন সেই শুভ মুহূর্ত্তে "মহান্ত সদ্‌গুরু" আসিয়া দর্শন দেন। তাঁহার দর্শন লাভ ঈশ্বরদর্শন-লাভের প্রায় সমতুল্য। তিনি কৃপা করিয়া যে দিন সমস্ত ভ্রম মুছাইয়া দিয়া, আমার জ্ঞানের সমক্ষে দিব্যালোককে প্রকাশিত করিয়া দেন, সে দিন আমার সব সন্দেহ, হৃদয়ের সমস্ত ধুক্‌ধুকানি মিটিয়া যায়। তারপর অবশভাবে তাঁহার আদিষ্ট-পথে চলিতে চলিতে আপনার মধ্যে চৈত্যগুরুর প্রকাশ হয়। তখন অন্ধকার কাটিয়া যায়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হয়। ভক্ত সাধক দেখেন—"তু তু করতে তু ভয়া মুঝমে রহা সমায়," অর্থাৎ "তুমি তুমি" করতে করতে "আমি" "তুমি" হইয়া গেল, এবং "তুমি"র মধ্যে "আমি" ডুবিয়া গেল। তখন "তুমি" "আমি" সব মিটিয়া গেল এবং এক অখণ্ড চিদ্‌ঘন আনন্দ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাই দ্রষ্টার স্বস্বরূপে

অবস্থান। এ অবস্থা "নিজ বোধরূপম্।" কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না; বোবার সন্দেশ খাওয়ার মতন, প্রকাশ করবার শক্তি নাই। যে ব্যক্তি সেই অপার আনন্দ-সিন্ধু "শুদ্ধ-জ্ঞানৈকরূপম্" পরম-ব্রহ্মকে জানিতে চাহিবে, সেও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবে। নদী যেমন সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সমুদ্রের সহিত অভিন্নাকারা হইয়া যায়, তদ্রূপ যে তাঁর স্বরূপসমুদ্রে একবার প্রবেশ করে, সে চিরদিনকার মত তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করে, আর কখনও উঠিয়া আসিতে পারে না। আচ্ছা, আজ তবে এই পর্য্যন্ত।

অধিকার

সকল লোকের অধিকার এক নয়। হিন্দুধর্ম্মের এটা হলো একটা গোড়ার কথা। এই অধিকার-তত্ত্বটি ভাল করে বোঝা চাই। অধিকার বিচার ক্রমশঃ যতই কমে আসচে, আমরাও সেই পরিমাণে সফলতা হইতে বঞ্চিত হচ্চি। পাশ্চাত্য শিক্ষাভি-মানী, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী আজকালকার অনেক

লোকই বলতে শিখেচে যে, সকল বিষয়েই সকলের অধিকার না থাকা অন্যায়, এবং এটা নাকি আমাদের সমাজের মস্ত একটা কলঙ্ক।

যে-সে বলে বলুক, কিন্তু যখন অনেক বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতেও এই একটা খট্‌কা বাজে, তখন বিষয়টার আলোচনা হওয়া ভাল।

অধিকার মানে যোগ্যতা। যোগ্যতা সকলের সকল বিষয়ে থাকতে তো দেখা যায় না। কোন কোন অসাধারণ পুরুষ আছেন, যাঁদের প্রায় সকল বিষয়েই যোগ্যতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসকল শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প, মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। তাই ইঁহারা অসাধারণ পুরুষ নামে খ্যাত। কিন্তু যাঁরা সাধারণ লোক; তাঁদের বড় জোর দুই একটা বিষয়ে যোগ্যতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যোগ্যতা আবার এক ধরণের নয়। কাহারও অঙ্কশাস্ত্র যোগ্যতা, কাহারও দর্শন অধ্যাপনে যোগ্যতা, কাহারও ইতিহাসে, কাহারও শিল্পে, কাহারও চিকিৎসায়, কাহারও গোরক্ষণে, কাহারও বাণিজ্যে, কাহারও দাস্যে, ইত্যাদি। কিন্তু যার গোরক্ষণে যোগ্যতা আছে, আমরা তার নিকট

সুচিকিৎসার আশা করি কি ? বা যাঁর দর্শনশাস্ত্রে যোগ্যতা আছে, আমরা তাঁহার মাথায় মোট চাপাইয়া চলি ? যদি একটা কুলির কাজ তাঁহার নিকট আশা করি, তবে আমাদের নিরাশা হবার সম্ভাবনা নাই কি ? এইরূপ এক ব্যক্তি চিরদিন দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং এ বিষয়ে হয় ত তাঁহার যথেষ্ট যোগ্যতাও থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতা আছে, অতএব তাঁহাকে চিত্রশালার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হউক, এই বলিলে কি বুদ্ধিমানের কার্য্য করা হইবে বা ইহা সমদর্শিতার কথা বলিয়া ইহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে ? আশা করি, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সমদর্শিতার কোট বজায় রাখিতে গিয়া এরূপ অসম্ভাব্য ব্যাপারকে সম্ভাবিত করিবার চেষ্টাকে মনে স্থান দিতে সাহস করিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যোগ্যতানুসারেই অধিকারের ভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ অধিকারকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তা যদি হয় তবে মনুষ্যের ক্রমবিকাশের দিকেই এ তত্ত্বটা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন ?

আম গাছে আম হয়, জাম হয় না, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। রবিশস্যগুলি মাঘ-ফাল্গুনে পাকিয়া উঠে তজ্জন্যও আমরা কখন কোন প্রশ্ন করি না। নদীর বালিতে ধান হয় না, কিন্তু অন্যান্য শস্য শশা-তরমুজ হয় তো হইতে পারে, তাহাতেও আমরা অধৈর্য্য প্রকাশ করি না। কিন্তু মনুষ্য ও মনুষ্যত্বের বিকাশও যে এই নিয়মের অধীন, একথা স্বীকার করিতে হইলেই আমাদের মন-প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে। কেন এরূপ হয়? ইহা কি অধৈর্য্যের চিহ্ন নয়? যেমন কোন কোন চঞ্চলব্যক্তি কিছুরই জন্য বিলম্ব সহিতে পারে না, অপেক্ষা করিতে পারে না; ইঁহারাও তেমনি ক্রমবিকাশের জন্য কাল হরণ করিতে ইচ্ছুক নন। সময় হবার পূর্ব্বেই ইঁহারা ফুটিতে চান। ইহাকে কখনই স্বাভাবিক অবস্থা বলা যাইতে পারে না। অনেক ফলকে অকালে পাকাইলে বা জোরপূর্ব্বক পাকাইলে তাহা পাকে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় পাকিলে যেরূপ সুন্দর ও সুস্বাদু হইত, অকাল-চেষ্টায় কখনই তাহার মধ্যে তেমন রসের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। অনেক সময় অবৈধ উপায়ে ফল পাকা দূরে থাক্,

তাহা পড়িয়া যায়। মানুষ যখন অস্বাভাবিকতা হেতু ক্রমবিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না, যখন সে মোহবশতঃ জোর করিয়া ফুটিতে চায়, তখন সে ফোটে বটে, কিন্তু টসিয়া যায় অর্থাৎ তাহা আর কোন কাজে লাগে না। দেবতা বা মনুষ্য কারও ভোগে লাগে না।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন অনেক মনুষ্য-ফলই এই অস্বাভাবিক বিকাশের ফলে দুনিয়ার কোন কাজেই লাগিতে পারে নাই। আর যেমন অকালে উদয় হইয়াছিল, সেইরূপ অকালেই ধ্বংস হইয়াছে। মানুষের মধ্যেও এই ক্রমবিকাশ পদ্ধতিকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। অস্বীকার করিলে অকালেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞানেরও সেই প্রকার একটা অধিকার আছে। অমনি যে সে যখন তখন মনে করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান তার লাভ হইবে না। ইহারও একটা সময় আছে, ইহারাও যোগ্য অধিকারী আছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা দূরে থাক্, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করবার অধিকার সকলের নেই, তাই তত্ত্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস-দেব "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রটির অবতারণা

করিলেন। অকালে বা কুক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন তাহাতে শস্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তিনি যদি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, তবে কখনই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইবে না।

বিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা যিনি "ব্রহ্ম-বর্চ্চস" লাভ করিয়াছেন, যিনি শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি অধিকার করিয়াছেন, যাঁহার শরীরে বল আছে, অথচ মনে বিকার হয় না, তাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন পুরুষই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী। এই সকল গুণাবলীর প্রকৃত ক্ষেত্রই হইতেছে বিপ্রের শরীর। কারণ স্বাভাবিক উপায়েই এই সকল গুণে তাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন। ইহাও ক্রম-বিকাশের ফল। যে ব্রাহ্মণের শরীর লাভ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে। আবার তিনি যদি তপস্বী হন, জিতেন্দ্রিয় ও মুমুক্ষু হন, তবে তো আর কথাই নাই। যাঁহার ব্রাহ্মণ-শরীর নহে, অথচ যিনি তপস্বী ও মুমুক্ষু, বুঝিতে হইবে, তাহাতে বীজ ঠিক পড়িয়াছে, কিন্তু ক্ষেত্র উপযুক্ত নয়। সুতরাং উপযুক্ত ক্ষেত্রে যে

ফল লাভ হইত সেরূপ ফললাভের তাহাতে সম্ভাবনা নাই।

ইহা অবিচার নহে, পক্ষপাতিতা নহে। যে ক্ষেত্রে ধান হইবার সেই ক্ষেত্রেই তো ধান হইবে। পাট এক রকমের, তাহার ক্ষেত্র এক রকমের, তুমি যদি জোর করিয়া তাহাতে ছোলা ছড়াও, তাহাতে ছোলা একেবারে হইবে না তাহা নহে, তবে ছোলার ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ যেরূপ হইতে পারিত, সেরূপ কিছুই হইবে না। সকল জমিতে আখ হয় না, তুমি যদি জোর করিয়া অবিচারে সমস্ত ক্ষেত্রে ইক্ষু রোপণ কর, তবে দেখিবে সব ক্ষেত্রে ফসল সমান হইবে না। খুব চেষ্টা করিলেও হইবে না। যদি হয় কোন্ ক্ষেত্রে বেশ পুষ্ট সুন্দর রসযুক্ত হইবে, আর অযোগ্য ক্ষেত্রের ইক্ষু সরু সরু ছোট ছোট কঞ্চির মত হইয়া আপনাদের ক্ষেত্রের অযোগ্যতাই প্রমাণ করিবে।

সেই জন্যই অধিকার লইয়া হিন্দুশাস্ত্রে এত মারা-মারি। অধিকার না মানিলে হিন্দুত্বের গোড়াতেই আঘাত করা হয়। এই অধিকারকে না মানি-য়াই, আজকাল কোন কাজেই কেহ কোন ফল

লাভ করিতে পারিতেছেন না। "স্বস্বকর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" স্বস্ব প্রকৃতিগত, জাতিগত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে সেই সেই কর্ম্মে কর্ম্ম-কর্ত্তার সাফল্য লাভ অত্যন্তই স্বাভাবিক। তাহা না মানিলে যে ফল লাভ হয়, আজকালকার বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী-রাই তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। ব্রহ্মজ্ঞান যেখানে স্বাভাবিক উপায়ে উদয় হয় নাই, কেবল পুঁথি পড়িয়া হইয়াছে, সে জ্ঞানে তো তাহার অধিকার নাই। সেই জন্যই দেখা যায় যে, মৌখিক ব্রহ্মবাদীদিগকে পদে পদে ঠোকর খাইতে হইতেছে, তাঁহার স্বরূপ ধরা পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু যিনি সত্য-সত্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে এরূপ ঠোকর খাইতে হয় না, এবং পদে পদে অক্ষমতা প্রকাশ পাইবার ভয়ে মিথ্যা ভাণেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। শূদ্র যদি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে চায়, তবে তার শরীরই যে তাকে মস্ত বাধা দিবে। আবার অবিমিশ্র ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলেও, শুধু বিপ্রশরীরেও তাহার বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। আমরা অযোগ্য বলিয়াই, আজকাল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার যতই ছড়াছড়ি হইতেছে, ততই আমাদের মস্তিষ্ক

বিকৃত, এবং অহঙ্কার অধিকতর বর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানের আস্ফালন বাড়িতেছে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার একটি আঁকড়িও মস্তিষ্কে পড়িতেছে না, এমনই অদৃষ্টের উপহাস !

রামব্রহ্ম। তবেই তো ভায়া, তুমি এক মস্ত গোলে ফেলে দিলে। ভেবেছিলাম শরীরটা ব্রাহ্মণের হয় ত কাজ হাঁসিল হতে পারে, ঐ মধ্যে থেকে আর এক ফ্যাকড়া বের করলে, ইতেই তো আবার হতাশ হতে হচ্চে।

মধু। ফ্যাকড়া আবার কি হলো ?

রামব্রহ্ম। ঐ যে তুমি বল্লে ব্রাহ্মণের শরীর হলেও হবে না, তার মধ্যে বীজের যোগ্যতা থাকা চাই। তা ভাই, আছে কি না, কি করে বলবো ?

মধু। যাই হোক চেষ্টা করতে আর ক্ষতি কি ? চেষ্টা করলেই যার যেটুকু যোগ্যতা ধরা পড়বে। সুতরাং যোগ্যতানুরূপ পুরুষকার সাহায্যে যতটুকু হইবার হইবে গুরুর কাছে শিষ্যের যোগ্যতা ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না। তবে শরণাগত প্রপন্ন-শিষ্যকে গুরুরা ছাড়েন না। চেষ্টা দ্বারা

তাকে যোগ্য করে নেন। হয় ত দুই-এক জন্ম এই যোগ্যতা লাভ করিতেই যাইবে।

রামব্রহ্ম। কি সর্ব্বনাশ তবে এ জন্মে হইবে না?

মধু। এত অধৈর্য্য হলে কি চলে দাদা? পূর্ব্বেই তো তোমাকে বলেছি, এসব বিষয়ে খুব ধৈর্য্য চাই, এবং খুব চেষ্টা চাই। এ দুইটির একত্র সম্মিলন হলে সফলতা লাভ অনিবার্য্য। তবে দুই-তিন জন্মের কথা যা বলেছি, তা বেশী মনে করো না। আমরা এত অযোগ্য যে, আমাদের সমস্ত ত্রুটী সংশোধন করতে হলেও খুব পৌরুষশালী পুরুষকেও দুই-তিন জন্ম কাটাইয়া যাইতে হইবে।

রামব্রহ্ম। আবার জন্মগ্রহণ করলে, অশুভের 'দকেও তো চেষ্টা হতে পারে? তখন?

মধু। না, তা বড় হয় না। "নহি কল্যাণ-কৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

রামব্রহ্ম। আচ্ছা ভায়া, গুরুর কাছে শিষ্যের যোগ্যতা ধরা পড়ে বল্লে, সে কি রকম?

মধু। সে আর শক্ত কি? তুমি কখন নিজে রেঁধে খেয়েছ? তা হলে একটা জিনিষ অবিশ্যি লক্ষ্য করে থাকবে। আমরা যে ইন্ধন-কাষ্ঠ দেখি,

সেগুলি এক রকমের নয়। কোন ইন্ধন সহজেই ধরে, আবার সহজে নেবেও না। এ গুলিই উত্তম কাষ্ঠ। মানুষের মধ্যেও এইরূপ অধিকারীই শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

আর এক প্রকারের ইন্ধন আছে, তাহারা ধরতে একটু বিলম্ব করে, কিন্তু একবার ধরলে বেশ জ্বলে, নিবতে জানে না। এগুলি মধ্যশ্রেণীর। মানুষের মধ্যেও এইরূপ মধ্যম অধিকারী দেখা যায়। প্রারম্ভের মুখে তাঁহাদের একটু বেগ পাইতে হয়, কিন্তু একবার লাগিলে আর ছাড়ে না।

তৃতীয় শ্রেণীর কাষ্ঠগুলি কি রকম জান? ধরিয়ে দাও, বেশ ধরে গেল, একটু অমনোযোগ দাও, আবার তখনি নিবে যাবে। এই জন্য এই সব কাষ্ঠ জ্বালাইতে অনবরত ফুঁ পাড়্তে হয়, নচেৎ কিছুতেই কাজ হাঁসিল হয় না। এই বেশ ধরে উঠেছে, কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হবার জো নাই, একটু বাতাস দেওয়া বন্ধ করেছ কি আর নিবে যেতে আরম্ভ করেছে। এ রকম কাঠে রাঁধুনীর বড় কষ্ট হয়। এই শ্রেণীর অধিকারীদের লইয়া গুরুদেরও বড় বিপদ্। বেশ আশাও পাওয়া যায়, এই জন্য ছাড়তেও ইচ্ছা করে

না, কিন্তু নজর অনবরত না রাখলেও হয় না। সমস্ত জীবনটাই এদের এই রকম চলে। একটু অমনোযোগ দিলেই আর রক্ষা নেই, অমনি দশ হাত মাটীর নীচে বসে পড়েছে দেখবে। সেই জন্য অনবরত এদের নিয়ে পাখার বাতাস দিতে হয়, ফুঁ পেড়ে পেড়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে যেতে হয়। তবে কি জান আগুনটা ধরতে পারে, এইটুকু এদের যোগ্যতা আছে।

আর চতুর্থ শ্রেণীর কাষ্ঠ ভিজে, জলসরা। যতই পাখা কর, যতই ফুঁ পাড় বাবা, কিছুতেই ধরবে না। মনুষ্যের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোক আছে। হাজার ফুঁ পাড়লেও কিছু হবার নয়। এমন ভিজে যে, কিছুতেই আগুন ধরতে চায় না। তবে এই টুকু ফল হয় যে, আগুনের সঙ্গে যোগ রাখলে কালক্রমে এর মধ্যে জলীয় অংশটা শুকিয়ে যেতে পারে। যা'ক এক কালে তো কিছু হবার ভরসা থাকে।

রামব্রহ্ম। ভায়া, আমার অবস্থা কতকটা এই চতুর্থ শ্রেণীর তা অবিশ্যি বুঝতেই পারচ। এখন ফুঁ পাড়বার লোক পেলে হয়। যা'ক্ ক্রমে জল-গুলো বেরিয়ে গিয়ে একটু আধটু শুক্‌নো হতে পার-

লেও পরম ভাগ্যি বলে মনে করা যায়। আচ্ছা, আজ উঠা যাক্ আবার কথাবার্ত্তা চলবে এখন। আমি সহজে তোমাকে ছাড়বো না। দেখ ভাই, ফুঁ পাড়বার ভয়ে যেন আমাকে ফেলে দিও না।

পরিশিষ্ট

গুরুর ধ্যান

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥
হৃৎপদ্মে কর্ণিকামধ্যসংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং
সচ্চিৎ-সুখাভীষ্টবরপ্রদানম্ ॥
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং
মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমূর্ত্তিম্ ॥
বামাঙ্কপীঠে স্থিতদিব্যশক্তিম্
মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপানিধানম্ ॥
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র

বটবিটপসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকল মুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি॥
চিত্রং বটতরোর্ম্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্য্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥
নিধয়ে সর্ব্ব বিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥
মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত পরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।

আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥
মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ ।
গুরোর্ব্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদং ॥
যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং,
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণম্ ।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং,
তং সংসারবিনাশহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদম্ ॥

———

গুরুমাহাত্ম্য

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণো ভবেৎ
গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যযন্ত্রকে ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥
শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ ।
গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে ॥

নরবুদ্ধিং বর্ণবুদ্ধিং গুরৌ চ গুরুমন্ত্রকে।
কদাচিন্নৈব কুর্ব্বীত কৃতে তু নরকং ব্রজেৎ॥
কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী-চরণোদকম্।
গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহানাং ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥
গুরৌ মনুষ্যতা বুদ্ধিঃ শিষ্যাণাং যদি জায়তে।
নহি তস্য ভবেৎ সিদ্ধিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥
মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুরক্ষতি পার্ব্বতি॥
অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ॥

গুরুর নমস্কার

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শোষনং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদাম্।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকং।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ং॥
বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং জগদ্গুরুং।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং সর্ব্বসংস্থিতম্॥
পরাৎপরং পরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্।
হৃদয়াকাশমধ্যেঽহং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্॥

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

দীনচর্য্যা।—মূল্য।৴০ আনা।

দেশমান্য সুকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত:—আপনার দিনচর্য্যা প'ড়ে উৎসাহ এবং উপকার পেয়েছি। এ বইটি বেশ কাজের হয়েছে।

ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অভিমত:—দিনচর্য্যা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি * * * আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয় সকল সরলভাবে বিবৃত; শেষের স্তোত্র ও সঙ্গীত-গুলির চয়নে সুরুচির ও জ্ঞান ভক্তির পরিচয় আছে। এরূপ গ্রন্থ সনাতনধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তকা-গারে থাকা উচিত। * * * * "দিনচর্য্যা" গ্রন্থের নিমিত্ত আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম।

ভাগলপুর টি, এন, জুবিলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ মহাশয়ের অভিমত:—পুস্তকখানি উপদেশপূর্ণ ও ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের বহু সারকথা সন্নিবেশিত

আছে। পুস্তখানি পড়িয়া আমি অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

পাকুড় রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত লালমোহন গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তক পড়িয়া যে পত্র লিখিয়াছেন:—এত অল্পের মধ্যে এত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত এতগুলি সৎশিক্ষার সমাবেশ আমি আর কোন পুস্তকে দেখি নাই। বর্ত্তমান সময়ের জড়-বিজ্ঞানসঙ্কুল বিদ্যালয়সমূহে ইহার স্থান হইবে কি না বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা না হইলেও বালকগণের সর্ব্বাঙ্গীন সৎশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন জন্য এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন জন্য, গৃহে গৃহে এই পুস্তকখানি রক্ষিত হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয়। * * * * সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বরের কৃপা তোমার প্রতি অক্ষুন্ন থাকুক; এবং সেই কৃপাবলে আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিকৃত-শিক্ষাহেতু বিপথগমনোন্মুখ যুবকগণের ও দেশের কল্যাণ সাধন কর।

রাজা বনবিহারী কপূর সি, এস, আই, মহোদয়ের অভিমত:—আপনার পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। ইহাতে অতি কঠোর দুরূহ ও

আধ্যাত্মিক বিষয় সকল এমন সরল ভাষায় প্রাঞ্জল-ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, ইহা সাধারণ পাঠকগণের সহজে বোধগম্য হইবে। ইহা অতীব প্রশংসনীয়।

প্রবাসী, উদ্বোধন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় একবাক্যে প্রশংসিত।

আশ্রম চতুষ্টয়।—মূল্য ॥০ আনা।

যথার্থ দেশহিতৈষী—দেশের গৌরব শ্রদ্ধাভাজন জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

পুস্তকখানি * * পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। * * এই নাটক নভেল গোয়েন্দা গল্পের বাজারে আপনার পুস্তক কতদূর আদৃত, প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইবে জানি না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দুর যে আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ভগবান্ আপনাকে সুস্থ শরীরে হিন্দুধর্ম্মের সেবার জন্য শক্তি প্রদান করুন, ইহাই আমার সর্ব্বান্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, মহাশয়ের অভিমত :--"দিনচর্য্যা" ও "আশ্রম চতুষ্টয়" বই

দুইখানি পড়িয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থকারের প্রত্যেক কথা তাঁহার নিজ সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। * * এরূপ খাঁটি অন্তরের কথা দ্বারাই অপরের চিত্ত স্পর্শ করা সম্ভবপর।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি যে পত্র লিখিয়াছেন—

"The Maharajadhiraja Bahadoor of Burdwan thanks you * * for a copy of "আশ্রম চতুষ্টয়" * *. He is much pleased with the book * * * ... !"

The Indian Mirror, Thursday December.

Asram Chatushtoya 29-9-16.

In this book, the author reproduces and explains the four stages of life which Manu enjoins on man to go through.

The authoreffectively points out the evils that have been caused to Hindu Society by the neglect of Manus injunctions. The author is not blind to the circumstances which have rendered the

adoption of the rules in their entirely at the present day, and he has accordingly suggested the next best course to be adopted. In the appendix have been given some choice quotations from, Manu, with Bengali translations, regarding religious and moral duties. The compilation, as a whole, is a creditable production.

প্রবাসী :—এই গ্রন্থে গ্রন্থকার হিন্দু আশ্রম চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্য ও পালনবিধি যুক্তিমূলক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রকেই ভিত্তি করিয়া চলিয়াছেন। * * * তিনি হিন্দুর সমস্ত আচার অনুষ্ঠানকেই যুক্তিমূলকতার আকার (rational light) দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই এ পুস্তকের বিশেষত্ব। * * যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের * * অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা এ গ্রন্থে অনেক শিখিবার বিষয় পাইবেন। এ গ্রন্থ এই জন্যই প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা উচিত।

উদ্বোধন :—পুস্তকের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন—"ব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং ব্রহ্মের সহিত

অবিচ্ছিন্ন মিলনই যদি জীবনের ব্রত হয়, তাহা হইলে জীবনযাপনের এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুন্দরতর ব্যবস্থা অসম্ভব।" লেখকের এই কথা পুস্তকে সুললিত ভাষায় সমর্থিত হইয়াছে, ইহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই সফলতার জন্য ভূপেন্দ্রবাবু পাঠকবর্গের প্রশংসাভাজন। * * ...।

বঙ্গদর্শন :—পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবের এই যুগে, ইংরাজী শিক্ষা-প্লাবিত দেশে এই গ্রন্থ দুইখানি যেন মাতৃভূমির পবিত্র আহ্বানের মত আমাদের সমস্ত হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়াছে। মানুষের সমস্ত জীবন যাপনের এবং প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের যে প্রণালী ভারতের প্রাচীন আদর্শ—তাহাই ভাল, না মানুষে মানুষে কঠোর প্রতিযোগিতা জীবনসংগ্রামের এই নিষ্ঠুরতা, পাশ্চাত্য আদর্শ, "dying in harness"ই ভাল—তাহা আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রবল স্রোতে আমাদের দেশের আদর্শ আজ নিমজ্জিত—আমরা পুরাতন হইয়াছি এবং নূতনও আমাদের 'ধাতের' সঙ্গে খাপ খায় নাই * * * * * *। এই গভীর সমস্যার দিনে গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে ভারতবর্ষীয়

আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। যে আদর্শে হিন্দুজাতি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সর্ব্বোত্তম ফল লাভ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার আজ সেই দিকে ফিরিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। * * * * । তাই সমস্ত দেশবাসীকে এই গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি মাত্র। * * * *

অভ্যাসযোগ।

মূল্য ॥০ আনা, ডাকব্যয় ⁄০ আনা, ভিঃ পিঃতে ॥৵০।

দিনচর্য্যা ও আশ্রমচতুষ্টয় প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। ইহাতে মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশ, গীতার নিগূঢ়ভাব, সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সুন্দর ব্যাখ্যা, দৈব ও পুরুষকারের শাস্ত্রসম্মত সুন্দর মীমাংসা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। মানবের মধ্যে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, অভ্যাস দ্বারা তাহা কিরূপে জাগরিত করিতে হয়, কিরূপে কদভ্যাসের প্রচণ্ড কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, এই সমস্ত উপদেশে এই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। যাঁহারা আপ-

নাদের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা অধ্যাত্মমার্গ অনুসরণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিবেন। কতিপয় ভক্ত ও জ্ঞানী মহাত্মাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি আরও সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

অভ্যাস-যোগ সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য।

ভারতী বলিতেছেন—(অভ্যাস-যোগ) "গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

জগদ্বিখ্যাত কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত হইতে লিখিয়াছেন —

"একবার মেলে আমি দুইখানি বই এক সঙ্গে পাইলাম। * * * একখানি আপনার "অভ্যাস যোগ"। দুইখানি আমার প্রবাসের বন্ধুরূপে দর্শন দিয়াছে। একটিতে আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য, আর একটিতে আমাদের দেশের সাধনা আমার সঙ্গ লইয়াছে—উভয়েতেই আমার প্রয়োজন এবং অনুরাগ।"

প্রবাসী বলিতেছেন—"সকল অধ্যায়গুলিই শাস্ত্রভিত্তি সুযুক্তি দ্বারা, সাধু মহাত্মাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত। কোথায়ও গোঁড়ামি ও অন্ধ-কুসংস্কারের প্রশ্রয় পায় নাই। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।"

বঙ্গদর্শন পৌষ ১৩১৯:—"বর্ত্তমান গ্রন্থ ভূপেন্দ্র-নাথের "ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলীর" তৃতীয় গ্রন্থ। তিনি ইতিপূর্ব্বে "দিনচর্য্যায়" হিন্দুর জীবনযাপন প্রণালীর এবং "আশ্রম চতুষ্টয়ে" হিন্দুর আশ্রম ধর্ম্মের বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি হিন্দুর ঐকান্তিক সাধনার পরিচয় দিয়াছেন। * * * * আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, গ্রন্থকারের সাধু ইচ্ছা সফল হউক। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, আবেগময়ী এবং গ্রন্থখানি নানা বহুমূল্য উপদেশ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থ-কারের কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাই-বার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। ছাপা, কাগজ ও আলোচ্য বিষয়ের তুলনায় পুস্তকের মূল্য অতি যৎসামান্য।"

উক্ত গ্রন্থকারের নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ।

"দীক্ষা ও গুরু তত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য পাঁচ আনা। ইহাতে দীক্ষা, ও গুরু শিষ্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় কথোপকথনচ্ছলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে যাঁহারা জিজ্ঞাসু তাঁহাদের অনেক সন্দেহ ইহাতে দূর হইবে।

দূর্ব্বাদল—ইহাতে উক্ত গ্রন্থকারের বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক নূতন ভাব, ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব এবং অনেক জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সুললিত ভাষায় ও সুযুক্তি সহকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এন্টিক কাগজে ছাপা—মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান। কলিকাতা মেডিক্যাল লাইব্রেরী, সান্ন্যাল এণ্ড কোং—২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউসে এবং ম্যানেজার কাশী যোগাশ্রম বেনারস সিটি ও গ্রন্থকারের নিকট পুরীতে পাওয়া যায়।